মহাকাশে
ভারতের
উজ্জ্বল
উপস্থিতি
—পৃঃ ...১৩

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কাশ্মীর পরিস্থিতি
পণ্ডিত নেহরুর
অপকর্মের
পরিণাম
—পৃঃ ...১১

৬৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ৮ আগস্ট ২০১৬।। ২৩ শ্রাবণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

অশান্ত কাশ্মীর

পাকিস্তান ভারতকে ভাঙতে চাইছে?

- গত কুড়ি বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে ১০,৯২১ জন সাধারণ নাগরিক ও ৪,৯৬১ জন নিরাপত্তা রক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন। শুধু গত দু'বছরেই ৮২ জন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি নিহত হয়েছে।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৮ আগস্ট - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,
Website : www.eswastika.com

মহাকাশে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি —পৃঃ ..১৩

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কাশ্মীর পরিস্থিতি পণ্ডিত নেহরুর অপকর্মের পরিণাম —পৃঃ ..১১

৬৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ।। ৮ আগস্ট ২০১৬ ।। ২৩ শ্রাবণ - ১৪২৩ ।। যুগাব্দ ৫১১৮ ।। website : www.eswastika.com ।।

অশান্ত কাশ্মীর

পাকিস্তান ভারতকে ভাঙতে চাইছে?

• গত কুড়ি বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে ১০,৯২১ জন সাধারণ নাগরিক ও ৪,৯৬১ জন নিরাপত্তা রক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন। শুধু গত দু'বছরেই ৮২ জন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি নিহত হয়েছে।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮
খোলা চিঠি : হাজার চুরাশির মা-মাটি-মানুষ
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯
২০১৭-র নির্বাচনে বোঝা যাবে জাতীয় দল অথবা আঞ্চলিক দল— কার পাল্লা ভারী □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
কাশ্মীর পরিস্থিতি পণ্ডিত নেহরুর অপরিণামদর্শিতারই পরিণাম
□ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১১
মহাকাশে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি
□ শশাঙ্ক দ্বিবেদী □ ১৩
ঢাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রমনা কালীবাড়ি
□ বরুণ দাস □ ২১
বাংলার নবজাগরণের নায়ক কালীপ্রসন্ন
□ রূপশ্রী দত্ত □ ২৩
কাশ্মীরের দীর্ঘকালীন ছায়াযুদ্ধ অপকৌশলী পাকিস্তান আমাদের দেশকে ভাঙতে চাইছে □ বেঙ্কাইয়া নাইডু □ ২৭
রসাল নন্দনের আলোক-রেখায় কান্ত-কবির গান
□ শুভঙ্কর দাস □ ২৯
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেখ হাসিনা কতটা আন্তরিক □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □
অন্যরকম : ৩৩ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭□ খেলা : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □
চিত্রকথা : ৪১ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

১৫ই আগস্ট সংখ্যা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনা : ভবিষ্যতের ভাবনা

ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি কাশ্মীরের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও সক্রিয়। কোথাও জনভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে, কোথাও বা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বিষয়টি নিয়ে যৌথভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেঃ জেঃ জে. আর. মুখার্জি এবং জাতীয় গবেষক অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায়।

স্বস্তিরা-র ২৯ আগষ্ট, ২০১৬ সংখ্যাটি 'নমামি গঙ্গে' বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে।

প্রয়োজনীয় কপি সত্বর বুক করুন।। দাম একই থাকছে ১০্ টাকা

বেঙ্গল সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা
সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর
তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi
Garam Masala

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আবেশের মৃত্যু : আধুনিকতার অর্থ পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়

কলকাতা মহানগরের এক অভিজাত এলাকায় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কন্যার জন্মদিবস উৎসবের সময় আবেশ দাশগুপ্ত নামে সতেরো বছর বয়সের এক কিশোরের মৃত্যু হইয়াছে। ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ঊনিশজন তরুণ-কিশোরের মধ্যে আবেশ হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কী কারণে তাহার মৃত্যু হইল এখনও তাহা জানা যায় নাই। কয়েকজন বন্ধু রক্তাক্ত আবেশকে গাড়ি করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইলে সেখানকার ডাক্তারবাবুরা তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও আবেশের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায় নাই। বালিগঞ্জের সানি পার্কের ওই আবাসনের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, মোবাইলের কলডিটেলসের সূত্র ধরিয়া আবেশের মৃত্যুরহস্যের সন্ধান করিতে গিয়া বেশ কিছু প্রশ্ন তদন্তকারীদের ভাবাইতেছে। আবেশের শোকার্ত মা ন্যায়বিচারের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিযোগ করিয়াছেন—তাঁহার পুত্র ষড়যন্ত্রের বলি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন যত প্রভাবশালী ব্যক্তিই হউক না কেন সংশ্লিষ্ট সকলকেই তদন্তের মুখোমুখি হইতে হইবে। মৃত্যু রহস্যের তদন্ত পুলিশ চালাইয়া যাইতেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু বাস্তব হইল আবেশ আর কখনও তাহার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিবে না। এখন প্রশ্ন হইল, তাঁহাকে এই নিদারুণ পুত্রশোকের বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়াছে যে ওই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সঙ্গে আবেশও মদ্যপান করিয়াছিল। যে স্থান হইতে আবেশের রক্তাক্ত দেহ তোলা হইয়াছে সেখানে মদের বোতলের ভাঙা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। আবেশের শরীরে এক স্থানে বোতলের ভাঙা কাচের আঘাতের ক্ষতচিহ্নও রহিয়াছে। তাহার মা-ও স্বীকার করিয়াছেন যে ওই পার্টিতে যাওয়ার আগে তিনি আবেশকে ১৮০০ টাকা দিয়াছিলেন। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার পুত্র অধিক রাত্রি পর্যন্ত নিজের বন্ধুদের সঙ্গে ‘চ্যাট’ করিয়াছে। এত ছোট বয়সে মোবাইল আসক্তি এবং পার্টিতে মদ্যপান—ইহাই প্রমাণ করে না কি আধুনিক সমাজের যে পরিবেশে আবেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহার জীবন প্রথমেই বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে? আধুনিক সমাজকে এই বিষাক্ত পরিবেশ হইতে যতদিন রক্ষা করা না যাইবে ততদিন এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিতেই থাকিবে। যেসব পরিবার নিজেদের আধুনিক সমাজের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, স্বাধীনতার নামে তাহাদের শিশুদের এতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না যাহাতে তাহারা সহজে বিপথগামী হইতে পারে। সন্তানেরা কোথায় যাইতেছে, কী করিতেছে, সেইগুলি দেখা প্রয়োজন। টাকা-পয়সা কীভাবে ব্যবহার করিবে, তাহাও শিখাইতে হইবে। বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কোন পথে ঠেলিয়া দিতেছে। কেতাবি শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের শিক্ষা যে কতটা জরুরি এই ধরনের ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। আধুনিকতার অর্থ পাশ্চাত্যের অনুকরণ, বিশেষত আমাদের সমাজের সঙ্গে যাহা সঙ্গতিপূর্ণ নহে—তাহা যে দুর্ভাগ্যই ডাকিয়া আনিবে তাহা সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে।

সুভাষিতম্

প্রদোষে দীপকশ্চন্দ্র প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যে দীপকোধর্ম সুপুত্রঃ কুলদীপকঃ।।

রাত্রিকালে চাঁদ আলো দান করে, দিনে আলো দান করে সূর্য। ত্রিলোককে আলো দান করে ধর্ম এবং সুপুত্র পুরো বংশকে আলোকিত করে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে গো-শুমারিতে গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় গো-রক্ষা কমিটি গো-শুমারির কাজ সাফল্যের সঙ্গে শুরু করল। জেলা সূত্রের খবর অনুযায়ী সাধারণ গ্রামবাসীরা এই কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। গো-শুমারির কাজ দেড় মাস ধরে চলবে।

ছবি : সৌজন্যে - দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ২১ জুলাই-এর মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গো-শুমারির প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি এবং গো-রক্ষা কমিটির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা এখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গোরু গুনছে। আমি গোরুর মাংস খাই কী পাঁঠা-মুরগি খাই সেটা আমার ব্যাপার। তুমি নাক গলাচ্ছ কোন অধিকারে? ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আমরা ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করব।' দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশেষ প্রভাবিত হননি। এদিকে, গোরক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্ট সুব্রত গুপ্ত এবং বেলদা গ্রামের বাসিন্দা দীপক পাহাড়ি-সহ আরও বেশ কয়েকজন গো-শুমারির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, বিষয়টি মোটেই রাজনৈতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক। এটি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাঁরা বেলদায় একটি দুগ্ধ ইউনিয়ন গড়তে চান। তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতেই এই উদ্যোগ। দীপক পাহাড়ি বলেন, 'আমার নিজেরই ১৮টি গোরু আছে কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৬টি দুগ্ধবতী। সাধারণ একটি গাভী বছরে ৯ মাস দুধ দেয়। আর ১৫ বছরের জীবনকালে ৭-৮টি বাছুর। আমি গড়ে প্রতিদিন ৪০ লিটার দুধ পাই। যদি মহাজনের কাছে বিক্রি করি তাহলে দাম ওঠে প্রতি লিটার ৩০ টাকা আর যদি সাধারণ খদ্দেরের কাছে বিক্রি করি তাহলে দাম ১৯-২২ টাকা প্রতি লিটার। প্রত্যেক গোরুর জন্য দৈনিক খরচ গড়ে ১০০-১৫০ টাকা। সব মিলিয়ে গড়ে দৈনিক লাভ ৪০০ টাকার মতো। কিন্তু উৎসব না থাকলে মহাজনেরা গ্রামে আসে না। এদিকে দুধ মজুদ করার ব্যবস্থাও এখানে নেই। সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর দুধ নষ্ট নয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে চাই। তাহলে আমরা ২.৫০ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণও পাব। গো-শুমারি সেই মিশনেরই অঙ্গ'।

কিন্তু তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর গবাদি পশুর উন্নয়নে অনেকগুলি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিল। তার কী হলো? দীপকবাবুর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের সুযোগ সুবিধা সবই পার্টিকর্মীরা ভোগ করে। এমনকী বাড়িতে কোনো গবাদি পশুর অস্তিত্ব না থাকলেও কোনো অসুবিধে হয় না।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা গাওনা গাইতে শুরু করেছেন কিছুতেই গোরক্ষা কমিটিকে তাদের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করতে দেওয়া হবে না। তাঁদের আশঙ্কা গো-শুমারি হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। গোরক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্ট সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'আমরা সংঘাতও চাই না, কারও বিশ্বাসে আঘাত করতেও চাই না। আমরা একটা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। আমাদের যদি কেউ থামানোর চেষ্টা করে আমরা প্রতিবাদ করব। আর যদি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তাহলে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলব।' গোরক্ষা কমিটির সমর্থনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলিপ ঘোষ বলেন, 'আমরা বাঘ গুনতে পারি, হাতি গুনতে পারি আর গোরু গুনলেই দোষ!' ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অবান্তর কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের অপমান করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানিতে ভারতের বিস্ময়কর সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সোনা ফলাতে শুরু করল। ২০১৩-১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত মোট ৩০০০ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিদেশে রপ্তানি করেছে। এইসব সরঞ্জাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি বিনিয়োগে চলা বিভিন্ন কারখানার উৎপাদন। ক্রেতাদের মধ্যে শ্রীলঙ্কা নেপাল আর মায়নামার প্রধান। এছাড়া রয়েছে মরিশাস রাশিয়া আর ইজরায়েল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী ভারত এখনও পর্যন্ত মরিশাসকে ৬৪২ কোটি, শ্রীলঙ্কাকে ৫৬৭ কোটি, রাশিয়াকে ৪৪৯ কোটি, মায়নামারকে ৪১৮ কোটি, ইজরায়েলকে ২১৫ কোটি আর নেপালকে ১৬৭ কোটি টাকার সরঞ্জাম বিক্রি করেছে।

রাজস্থানে শিক্ষায় ভারতীয়করণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের প্রথা-প্রকরণ জানার জন্য এতকাল এদেশের ছাত্রদের বিদেশি লেখকদের বই অথবা বিদেশি ভাবধারায় লেখা ভারতীয় লেখকদের বইপত্রের ওপর নির্ভর করতে হোত। সম্প্রতি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় এই বাধ্যবাধকতা থেকে ছাত্রছাত্রীদের মুক্তি দিতে পাঠক্রম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরের এই নতুন পাঠক্রমে গীতা, রামায়ণ এবং অর্থশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানা গেছে। এই পাঠক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সব কলেজে লাগু করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই নতুন পাঠক্রম চালু হবার পর ছাত্রছাত্রীরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন থেকে আধুনিক ম্যানেজমেন্টের বিবিধ প্রণালী শিখতে পারবে। কিংবা, বানরসেনার সাহায্যে রাবণের বিরুদ্ধে রামের যুদ্ধযাত্রা থেকেও ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত অনেক পাঠ পাওয়া যায় বলে তারা মনে করেন। এ ব্যাপারে 'ম্যানেজমেন্ট চিন্তন' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজিত করার ভাবনা রয়েছে, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে।

নবীন মাথুর

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম রিভিশন প্যানেলের প্রধান নবীন মাথুর বলেন, 'কেউ যদি কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের অংশটি পড়েন, বুঝতে পারবেন ভগবান কৃষ্ণ কত সুন্দরভাবে শ্রমবিভাগ, প্রেরণা, দায়বদ্ধতা এবং নেতৃত্বের মানদণ্ডগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।' তাঁর সশ্রদ্ধ স্বীকারোক্তি, 'ভগবান কৃষ্ণের ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত আছে কর্মেই ঈশ্বর সাধনার মতো কথা এবং নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব।'

আধুনিক করপোরেট জগৎ পেশাদারি নৈতিকতা দাবি করে। ভগবান কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনকে ন্যায় ও নীতির আকর আখ্যা দিয়ে নবীন মাথুরের সংযোজন, 'আধুনিক ম্যানেজমেন্টের সাফল্যের মন্ত্র রয়েছে এখানে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কীভাবে আরও ভালো মানুষ হতে পারি তারই সন্ধান দিয়েছেন ভগবান।' তিনি মনে করেন গীতার প্রেরণায় যদি ম্যানেজাররা যথাযথ উদ্বুদ্ধ হন তাহলে দুর্নীতি বলে কোনো শব্দ এদেশে আর থাকবে না এবং শ্রমিকসমস্যারও স্থায়ী সমাধান হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পাঠক্রমের এই বদল শিক্ষায় ভারতীয়করণ প্রকল্পেরই একটি অঙ্গ। ধীরে ধীরে স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর রচনাও এই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ছাড়া অন্তর্ভুক্ত করা হবে ভারতীয় যোগ সংক্রান্ত কয়েকটি রচনা। নবীন মাথুর জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন থেকে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে কীভাবে একজন যোগী বিশ্বায়নের মতো আধুনিক বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে পারেন কিংবা করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে ভারতীয় যোগের কী সম্পর্ক।

ইম্ফল রেলস্টেশনের শিলান্যাস করলেন সুরেশ প্রভু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে রেলস্টেশনের শিলান্যাস করে ইম্ফলকে ভারতের রেল মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। জিরিবাম থেকে ইম্ফল পর্যন্ত প্রায় ১১ কিলোমিটার লাইন সম্প্রসারণ করে এই নতুন স্টেশন তৈরি করা হবে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮.৭ কোটি টাকা। এছাড়া ডিমাপুর থেকে কোহিমা পর্যন্ত আরও একটি নতুন রেলপথের শিলান্যাস করেন তিনি। এই কাজ ২০২০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি জানান। রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, দেশের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীকে রেল সংযোগে আনার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক গ্রহণ করেছে তারই বাস্তবায়নের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির দিকে এই বিশেষ নজর।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামছাড়া হিন্দুদের সমীক্ষা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামের হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে শহর বা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য হওয়ায় চোরাচালান বা দেশবিরোধী কাজের মুক্তাঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। উত্তরে কোচবিহার জেলা থেকে শুরু করে একেবারে দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির চিত্র একথাই প্রমাণিত করে। এই দৃষ্টিতেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গত দশ বছরে কত হিন্দু নিজের বাড়িঘর ছেড়ে শহরে বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন তার সমীক্ষা শুরু করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা নদীয়া, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা— এই সাতটি জেলায় হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহ জানান, সমীক্ষায় মুখ্যত থাকবে : (১) ১০ বছর আগে গ্রামে কত হিন্দুর বাস ছিল। (২) বর্তমানে কত? (৩) এলাকা ছেড়ে হিন্দুরা কোথায় গিয়েছে। (৪) কারণ কী? (৫) ওই গ্রামে মুসলমান সংখ্যা কত বেড়েছে। (৬) তাদের জমি জায়গা ও আর্থিক আয়ের উৎস কী?

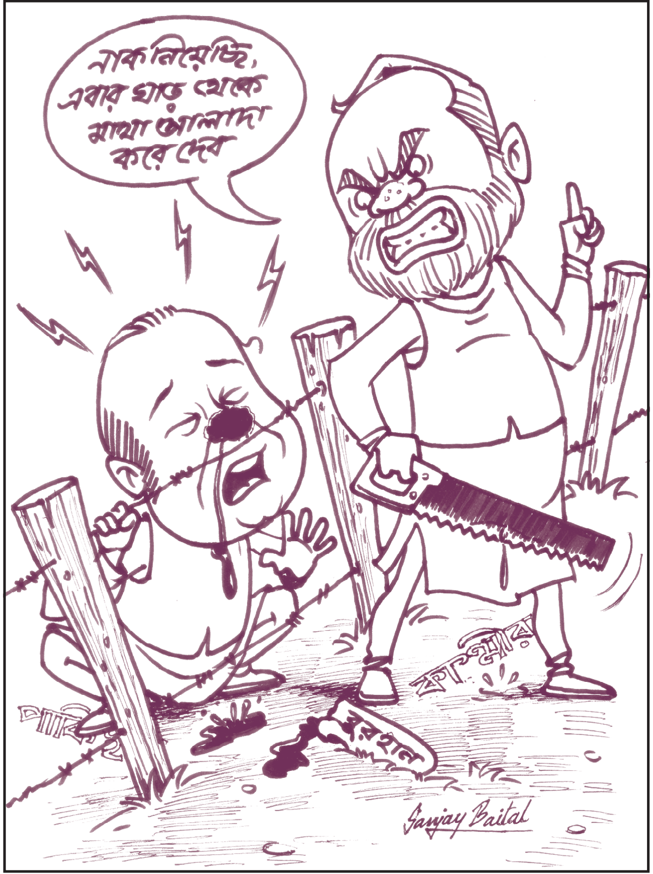
নাক নিয়েছি, এবার ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করে দেব
কাশ্মীর
বুরহান
Sanjay Baital

উবাচ

“আমরা অকারণে মানুষ খুন করতে পারি না। তবে সেনাবাহিনী যেখানে যাবে তাদের সঙ্গে বাহিনীর ক্ষমতাও যাবে। এটা যদি মেনে নেওয়া না যায় তা হলে বাহিনীকে কোথাও না পাঠানোই ভালো।”

মনোহর পর্রিকর
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

মণিপুর থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে।

“আমরা যদি ক্রমাগত আমাদেরই শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাকি তাহলে কাশ্মীরের যে আজাদির কথা বলা হচ্ছে তার কী হবে! ভারত বা পাকিস্তান এই দুটো দেশেরও কি কোনো অর্থ থাকবে? আমি বিশ্বাস করি এসব (সন্ত্রাসবাদ) করে কোনো লাভ হয় না।”

মেহবুবা মুফতি
কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

কাশ্মীরের আজাদি প্রসঙ্গে।

“পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না। যখনই কথা বলা হয় ওরা একটা না একটা ঝামেলা বাধায়। পাঠানকোটে করল... কাশ্মীরে তো একটার পর একটা অশান্তি করেই চলেছে। সরকারকে শীগগির কোনো রাস্তা বের করতে হবে যাতে এর উচিত জবাব দেওয়া যায়।”

আর কে সিং
বিজেপি সাংসদ এবং
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব

কাশ্মীরের অশান্তিতে পাকিস্তানের উস্কানি প্রসঙ্গে।

“কাশ্মীরের মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারতে থাকতে চান। ওঁরা হয়তো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারছেন না কিন্তু তার মানে এই নয় ওঁদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ওঁরাই কাশ্মীরের প্রকৃত মুসলমান। অন্য যে কোনো ভারতীয়ের মতো দেশভক্ত।”

ইন্দ্রেশ কুমার
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক
সঙ্ঘের কেন্দ্রীয়
কার্যকারিণীর সদস্য

সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে কাশ্মীরিদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে।

খোলা চিঠি

হাজার চুরাশির মা-মাটি-মানুষ

প্রিয় পাঠক,

চলে গেলেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখা কারও পছন্দ, কারও অপছন্দ হতেই পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। মৃত্যুর পরে সাধারণত প্রয়াতর নিন্দা না করাই রীতি। কিন্তু একটা কথা বলতেই হয়, রাজনীতি সমাজকে যেভাবে গ্রাস করেছে তাতে চিরকাল যিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তিনি মৃত্যুর পরে পেলেন রাষ্ট্র-শক্তির গান স্যালুট।

ছিলেন---হাজার চুরাশির মা হয়ে গেলেন— হাজার চুরাশির মা-মাটি-মানুষ।

রাজনীতিবিদেরা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সাংস্কৃতিক দক্ষতা। কখনও তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন, ছবি এঁকেছেন, নাটক লিখেছেন। কখনও কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে টেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক আবর্ত গড়ে তুলেছেন। কখনও প্রশাসনিক ভবন থেকে তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন নন্দন চত্বরে। আবার কখনও রাজনৈতিক ধরনার মঞ্চে রং-তুলি-ক্যানভাসের আয়োজন রেখেছেন। এহ বাহ্য, নিজেদের সংস্কৃতিমনস্কতা প্রকাশের প্রতিযোগিতার অন্যতম অস্ত্র হিসেবে রাজনীতিবিদেরা চিরকালই বেছে নিয়েছেন 'দেহ দখল'-এর কৌশল। যেন মৃত শিল্পী বা সাহিত্যিকের মরদেহ সৎকারের দায়িত্ব নিতে পারলেই সংস্কৃতিমনস্কতার বৃত্তটি পূর্ণ হয়!

বাম আমলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। মৃত্যুর পরেও যাতে রাজনীতির শিকার হতে না হয়, তার ব্যবস্থা জীবিতাবস্থাতেই করে গিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। পরিবারকে নিভৃতে সৎকারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। কথিত, শম্ভু মিত্রের মরদেহ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় ঘনিষ্ঠ মহলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন 'সংস্কৃতিবান' বাম নেতারা। ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর। গান স্যালুটে মৃত কবিকে বিদায় জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। একদা বামপন্থী সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ জীবনে তৃণমূলঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। সুভাষঘনিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকেরা বলেন, সকলের চোখের সামনে মৃতদেহের 'দখল' নেওয়া হয়েছিল। পাছে বামেরা লাল পতাকা বিছিয়ে দেয় শরীরে! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেও একই অভিযোগ উঠেছিল। হাতের নাগালে ছিলেন না মান্না দে। তার জন্য বডি না পাওয়ার আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল শাসকদল তথা খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে নিয়ে আস্ত একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে গান স্যালুট। সুচিত্রা সেনের মুখ দেখতে পায়নি রাজ্য কিন্তু রাজকীয় শেষযাত্রা দেখেছে। তাঁর মেয়ে মুনমুনকে সাংসদ হিসেবে পেয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যুর পরেও সেই রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে মরদেহ 'দখল'-এর প্রশ্ন ছিল না। গত এক দশকে মহাশ্বেতা প্রকাশ্যে তৃণমূল এবং দলনেত্রীকে সমর্থন জানিয়েছেন।

রাজ্যে 'পরিবর্তন পর্বে' তৃণমূলে যোগদানের হাওয়া ছিল প্রবল। কিন্তু মহাশ্বেতা 'তৃণমূল' ছিলেন না। আবার গত এক দশক তৃণমূলের বাইরেও ছিলেন না তিনি। ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে যে জমির আন্দোলনে তৃণমূলের 'পথ' নির্দিষ্ট হতে শুরু করে, সেখানেই মমতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন 'বামপন্থী' মহাশ্বেতা। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে মমতার আন্দোলন গোড়াতেই যে বাড়তি মাত্রা পেয়েছিল, তার অন্যতম কারণ মহাশ্বেতার সমর্থন। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মমতার জমি আন্দোলনে 'বামপন্থী গন্ধ' পেয়েছিলেন অনেকেই। তাকে সিলমোহর দিয়েছিল মহাশ্বেতার সক্রিয় অংশগ্রহণ।

তবে বারবার মতবিরোধ ঘটেছে। মহাশ্বেতা উল্টো সুরে গেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই মমতা-দূত গিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। মহাশ্বেতার মতো প্রতিবাদী লেখিকাকে মঞ্চে বসিয়ে নিজের বক্তব্য অস্বীকার করিয়েছেন মমতা। অনেক সময়ে যে লিখিত বক্তব্য তিনি পেশ করেছিলেন তা দলীয়ভাবে লেখা বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শেষদিকে অবশ্য শারীরিকভাবে দুর্বল মহাশ্বেতা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

তাই, তৃণমূলনেত্রীর অধিকার আছে মহাশ্বেতার সৎকারের ব্যবস্থা করার। কিন্তু তাতে যোগ দেননি মহাশ্বেতা-মুগ্ধরা। তৃণমূল পরিবিষ্ট পরিবেশে মানসিকভাবে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা। রবীন্দ্রসদনে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কম হওয়ায়, নেত্রী রুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সত্যটি উপলব্ধি করলেন কি?

একদা যে কবি ফুটপাথ বদলের 'অ্যানার্কিজম' চর্চা করেছিলেন, একদা যে সাহিত্যিক আদিবাসী 'দ্রৌপদী'র রাষ্ট্রবিরোধী ক্ষোভ ফুটিয়ে তুলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুটের শব্দে তাঁর অন্তিমযাত্রা গুণমুগ্ধদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। মনে হয়েছে, এটা তো শাসকদলের কর্মসূচি।

—সুন্দর মৌলিক

২০১৭-র নির্বাচনে বোঝা যাবে জাতীয়দল অথবা আঞ্চলিক দল—কার পাল্লা ভারী

আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের প্রথম দিকেই দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনের ফলাফলে বোঝা যাবে জাতীয় দল অথবা আঞ্চলিক দলের পাল্লা কার কতটা ভারী। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারে নীতিশ-লালু, উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম, দিল্লীতে অরবিন্দ কেজরিবাল আঞ্চলিক দলের জোট গড়ে কেন্দ্র ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছেন। জাতীয় দল হিসাবে বিজেপি এবং কংগ্রেস তার প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। এমন একটা যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, গোয়া এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্য বিধানসভায় ভোট হবে। এই ভোটের ফলাফল নিঃসন্দেহে জাতীয় রাজনীতিতে বড় রকম প্রভাব ফেলবে। পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ভোট সবার শেষে। তাই অন্য চারটি রাজ্য নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক্।

যে পাঁচটি রাজ্যে ২০১৭ সালে ভোট হবে তার দিনক্ষণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর এবং গোয়ায় বিধানসভার নির্বাচন মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হবে। শুধু উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন শেষ করতে হবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। যদিও রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে সবার আগে রাখতে হবে, তবে অন্য চারটি রাজ্যের ফলাফলকে উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ, এই চারটি ছোট ছোট রাজ্যে সর্বভারতীয় দল বিজেপি এবং কংগ্রেসের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এখানে আঞ্চলিক দলেরও সরব উপস্থিতি আছে। চলতি বছরে (২০১৬) যে সব রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে আঞ্চলিক দল ক্ষমতায় এসেছে বিপুল সমর্থন নিয়ে। অসমে ক্ষমতা দখল করেছে জাতীয় দল বিজেপি। কংগ্রেস চলতি বছরের সব রাজ্যের নির্বাচনেই ব্যর্থ হয়েছে। আগামী বছরে কংগ্রেস আবার ব্যর্থ হলে গান্ধী পরিবারের নেতৃত্ব নিয়ে দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ২০১৭-র নির্বাচন কংগ্রেসের অস্তিত্বের লড়াই বললে খুব একটা ভুল হবে না। বিজেপির কাছেও অগ্নিপরীক্ষা। গোয়া, পাঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখা ছাড়া বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ থাকবে উত্তরাখণ্ডে তার হারানো দুর্গ জয় করা। আঞ্চলিক দলের মধ্যে আম আদমি পার্টি এবারই প্রথম পাঞ্জাব, গোয়া এবং উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

গূঢ় পুরুষের

কলম

যে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে চারটিতে ২০১৭-র মার্চ মাসে নির্বাচন হবে সেখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কেমন বিচার করা যাক। প্রথমেই পাঞ্জাবের দিকে তাকাই। দিল্লীর কাছেই অবস্থিত এই রাজ্যে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে বিজেপি, শিরোমণি অকালি দল এবং কংগ্রেস। এর মধ্যে বিজেপি এবং শিরোমণি অকালি দলের জোট (এনডিএ) এখন পাঞ্জাবে ক্ষমতায় আছে। ১১৭টি আসনের পাঞ্জাব বিধানসভায় ক্ষমতাসীন জোটের হাতে আছে ৬৮টি আসন। ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে পাঞ্জাবের মোট ১৩টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন জোটের প্রার্থীর জেতেন মাত্র ৬টি আসনে। শিরোমণি অকালি দল চারটি এবং বিজেপি দু'টি আসন পায়। অন্যদিকে এই প্রথম পাঞ্জাবের নির্বাচনে লড়ে আম আদমি পার্টি জিতে নেয় চারটি সংসদীয় আসন। কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে তিনটি আসন। তাই এবার পাঞ্জাবে লড়াইটা হবে ত্রিমুখী। এনডিএ জোট বনাম কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি। বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ পাঞ্জাবের গড় রক্ষা করা। ব্যর্থ হলে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে।

উত্তরাখণ্ড দখল করাটাও বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই রাজ্যে মোট ৭০টি বিধানসভা আসন আছে। ২০১২ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৩০টি আসন এবং কংগ্রেস ৩১টি আসনে জিতে উত্তরাখণ্ডে ক্ষমতায় আসে। পরে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিধায়ক ভাঙিয়ে কংগ্রেসের শক্তি বেড়ে হয় ৩৩। মায়াবতীর বি এস পি জেতে ৩টি আসনে এবং নির্দলদের হাতে আছে ৪টি আসন। নিঃসন্দেহে উত্তরাখণ্ড বিজেপি প্রভাবিত রাজ্য। সামান্য ব্যবধানে ২০১২ সালে বিজেপি হেরেছিল। তারপর গত চার বছরে বিজেপি সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তরাখণ্ডে আঞ্চলিক দলের প্রভাব নেই বললেই চলে। এই রাজ্যে টক্কর দুই সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাকি দুটি রাজ্য হচ্ছে মণিপুর এবং গোয়া। মণিপুরের ৬০টি বিধানসভার আসনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কংগ্রেসের হাতে এখন ৪৭টি আসন। বিধানসভায় মাত্র ২টি আসন বিজেপির। তবে অসমে বিজেপি বিপুল সাফল্য পাওয়ার পর এই জাতীয় দলটি সর্বশক্তি দিয়ে মণিপুর দখলে ঝাঁপাবে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে জাতীয় দলেরই প্রভাব বেশি। গোয়া বিধানসভার ৪০টি আসনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। তবে এবার অরবিন্দ কেজরিবালের আম আদমি পার্টি পুরো শক্তি নিয়ে লড়বে বিজেপিকে গোয়ায় ক্ষমতাচ্যুত করতে। গোয়ায় সফল হলে কেজরিবাল আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বের প্রধান মুখ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। ■

উত্তর সম্পাদকীয়

কাশ্মীর পরিস্থিতি পণ্ডিত নেহরুর অপরিণামদর্শিতারই পরিণাম

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

আবার অশান্ত কাশ্মীর। এবার উপলক্ষ্য নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সন্ত্রাসবাদী হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যু। পুলিশ-বিদ্রোহী খণ্ডযুদ্ধে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। দু'পক্ষের আহত হয়েছে অন্তত ৩৪০০ জন। কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী চক্রান্তের মূল পাণ্ডা যে পাকিস্তান তা আগে বহুবার টের পাওয়া গেছে; এবার তার উসকানি প্রকাশ্যে এসেছে। পাক-প্রধানমন্ত্রী জেহাদি নেতার মৃত্যুতে 'গভীর শোক' প্রকাশ করেছেন, শোক প্রকাশ করেছে জামাত-উদ-দাওয়ার মতো জঙ্গি সংগঠনের নেতা হাফিজ সইদও। পাক বিদেশমন্ত্রক একে 'এক কাশ্মীরি নেতার বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড' বলে বর্ণনা করেছে। এই মৃত্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের হাতে পাকিস্তানের পতাকা শোভা পেয়েছে। পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ দাবি করেছেন, কাশ্মীর কখনই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। ফের একবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হয়েছে ইসলামাবাদ। তাঁদের দাবি, কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাই অবিলম্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুক। ভারতের বিদেশমন্ত্রক পাল্টা জবাব দিয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিবছরই কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলে। উপত্যকাকে অশান্ত করার পেছনে তাদের ভূমিকা কারোও অজানা নয়। এক কথায় সংঘর্ষ ও বাদানুবাদে অগ্নিগর্ভ ভূস্বর্গ।

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শিতারই ফল। তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বিষয়টিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যান। পাকিস্তানের গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই সেনাবাহিনী নির্ভর যারা ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে ৫ বার সামরিক অভ্যুত্থান করে। এই কারণে ১৯৫৫ থেকে ৫৭ সালের মধ্যেই চার পাক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। গত ৩০ বছর ধরে তারা অধিকৃত কাশ্মীরে লস্কর-ই-তৈবা, জৈস-ই- মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন, আলকায়দার মতো সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে ঘাঁটি গাড়তে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে আসছে। তাদের সাহায্যেই এইসব দলের দালালরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট কাশ্মীর সরকারকে বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দিতে বাধা দিচ্ছে। তাদের এই জঘন্যতম খেলার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হলো মাশারাত আলম, হুরিয়ত কনফারেন্সের মতো দলগুলির ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ভয় দেখানো। এখন ইসলামের নামে আলকায়দা ও আইসিস্ সরাসরি কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে।

ঋষি কশ্যপের তপোভূমি বলে অতীতে কাশ্মীর কাশ্যপামার বলে পরিচিত ছিল যা আজ পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দখলে চলে গেছে। খৃষ্টপূর্ব ৯০০ শতক নাগাদ এটি হিন্দু সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান ছিল। আর এই কাশ্যপামারই কাশ্মীরি শৈব সম্প্রদায়ের ধাত্রীভূমি। ১৩৪৬ সাল পর্যন্ত অনেক হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন। হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করে, হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে ১৫৮৬ সালে মুঘলরা কাশ্মীরে কর্তৃত্ব কায়েম করে। যদিও ১৭৫২ সালে আফগানরা এসে মুঘলদের বিতাড়িত করে। ১৮১৯ সালে কাশ্মীর শিখ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে পরিণত হয়। ১৮৪৬ সালে শিখ যুদ্ধের পর লাহোর ও অমৃতসর চুক্তির মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর হিন্দু ডোগরা সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। শেখ আবদুল্লা ডোগরাদের বিরুদ্ধে কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। মহারাজা হরি সিং-য়ের বিরুদ্ধে তিনি পুঞ্চ আন্দোলন চালান যার জেরে হরি সিং ১৯৪৬ সালে বন্দি হন। পাকিস্তান সমর্থিত হানাদাররা কাশ্মীর দখল করে নেয়। পরে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭-এর অক্টোবরে হরি সিং ভারত সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। তারপর নেহরু সংবাদমাধ্যমের কাছে বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই প্রস্তাব করে টেলিগ্রাম পাঠান যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারত ও পাকিস্তান যৌথভাবে কাশ্মীরে গণভোটের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবেদন করুক। সর্দার প্যাটেল কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই ভারতের ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করতে পেরেছিলেন অথচ, নেহরুর এই এক পদক্ষেপের ফলে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সঙ্কট তৈরি হলো। ১৯৫২-র ২৬ জুন নেহরু সংসদে ভাষণ দিয়েছিলেন যে— "...কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করুক। আমরা তাঁদের জোর করব না। সেই অর্থে কাশ্মীরের লোকেরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।" তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বেই ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে জম্মু-কাশ্মীরের গণভোট নিয়ে একটি শ্বেতপত্রও প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা বলতে শুরু করেন যে, নেহরুর বিবৃতি ও টেলিগ্রামের কোনো আইনি বৈধতা নেই এবং তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক নয়, কেননা তা কখনই সংসদে পাশ করানো হয়নি। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫০ সালে। সে কারণে নেহরুর প্রকাশ করা শ্বেতপত্রও বৈধ নয়। তাছাড়া গণভোট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। গণভোট সংক্রান্ত বিল সংসদের উভয়কক্ষেই অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ হওয়া প্রয়োজন। আর তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধানের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে 'জম্মু-কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের

অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা থাকবে’। নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচিত বিধানসভা ১৯৫৬ সালে সংবিধানের এই ধারা গ্রহণ করেছে। ইন্দিরা বা রাজীব গান্ধী নেহরুর এই ‘প্রতিশ্রুতি’ প্রয়োগ করার কোনো চেষ্টা করেননি। উল্টে, ১৯৪৭ সালে ইন্দিরা শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ঐক্যমত্য হয়ে এই গণভোটের সমস্ত সম্ভাবনাকেই নষ্ট করে দেন। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫, ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণ আইনসম্মত ও বৈধ কাজ ছিল। এই কারণে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সর্বাত্মক ও অপরিবর্তনীয়। জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদ তার ভারতভুক্তির দলিলকে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করে তাদের সংবিধানে জম্মু- কাশ্মীরের ভারতের সঙ্গে মিশে যাওয়াকে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পূর্বতন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ও কাশ্মীর পরিষদের সভাপতি, আইনজ্ঞ রাম জেঠমেলানি ২০১৪-র নভেম্বর মন্তব্য করেছেন যে, ‘‘ভারতের গণপরিষদ জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান তৈরি করেনি, বরং জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদ তাদের সংবিধান বানিয়েছে। এটাই একটা গণভোট ছিল। জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধানের কিছু নির্দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে কারণে সেখানে গণভোট হয়ে গেছে। কাশ্মীরের জনগণ ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না, বরং জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদ যে সংবিধান তৈরি করেছে তা মেনে চলেন। আর তাদের সংবিধান ভারতীয় সংবিধানের একটা অংশকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।” তাঁর বক্তব্যের আইনসঙ্গত দাবি জম্মু-কাশ্মীরে নেহরুর গণভোটের প্রস্তাবকে পুরোপুরি খণ্ডন করে দিয়েছে, যদিও তিনি কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গিয়ে এক গভীর সঙ্কট তৈরি করেছেন যা এখন তীব্রতর হয়েছে। সেখানকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দেশের বিপুল সম্পদ বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই কাশ্মীরকে দখল করার এক অপচেষ্টা পাকিস্তান চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, ১৯৪৮ সালে পাকসেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। ভারতীয় সেনারা কাশ্মীরকে পাক দখলমুক্ত করার জায়গায় পৌঁছে গেলে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেন। পরিণামে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রাখে পাকিস্তান যা আজও দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নেহরু সরকার কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা জারি করে এবং তার পরপরই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা আবদুল্লা কাশ্মীরকে মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। ভারতের ভিতরে থেকেও কাশ্মীরকে একটি ‘স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র’ হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি যাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন পণ্ডিত নেহরু। বস্তুত সেখান থেকেই কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের শুরু হয়। শেখ আবদুল্লার দাবি মেনে কাশ্মীরের জন্য আলাদা পতাকা, প্রধানমন্ত্রী ও বিচার ব্যবস্থা-সহ বিশেষ মর্যাদা অনুমোদন করার নেহরুর ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে ঢুকে অনশন আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের জেরে সরকার পরিচয়পত্রের নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ১১ মে শেখ আবদুল্লার পুলিশের হাতে তিনি বন্দি হন এবং বন্দীদশাতেই এক রহস্যময় পরিস্থিতিতে ১৯৫৩-র ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আজ পর্যন্ত অজানা থেকে গেলেও তাঁর মৃত্যুর দায় থেকে নেহরুকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান আবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় যাতে দু’দেশই নির্ধারিত সীমানা বরাবর তাদের পুরনো অবস্থানে ফিরে যায়। ওই বছরই জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট তৈরি হয়। এরপর একাত্তরের যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হলে ইন্দিরা গান্ধী ও পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে সিমলা চুক্তি হয়; দু’দেশই সম্মত হয় যে কেউ তাদের লক্ষ্মণরেখা পার করবে না যার নতুন নামকরণ হলো নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of control)। ১৯৮৯ সালে কাশ্মীরে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয় যার ফলে জন্ম নেয় মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠী। সোভিয়েত আফগান যুদ্ধ শেষে আফগান মুজাহিদিনরা উপত্যকায় ঢুকে ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট নেতা ইয়াসিন মালিক, আসফাক মজিদওয়ানি ও ফারুক আহমেদ দারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হত্যালীলা শুরু করে। আই এস আই ও পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় প্রায় ৫০০ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করে, ব্যাপকভাবে তাদের নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে জঙ্গিরা হজরতবাল মসজিদ দখল করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে একমাস ধরে লড়াই চালায়। তারপর তারা চরার-ই-শরিফ জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৯৯ সালে বিদ্রোহীসহ পাক-সেনারা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকতে শুরু করে। শীতের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে সেনারা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে। সেই সুযোগে পাকসেনারা জেনারেল পারভেজ মুশারফের নির্দেশে কার্গিলের উঁচু খালি শৃঙ্গগুলি দখল করে নেয়। ভারতীয় সেনারা দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে অনুপ্রবেশকারী পাকসেনাদের হঠিয়ে দিয়ে কার্গিল শৃঙ্গ পুনর্দখল করে। শ্রীনগর ও আশেপাশের এলাকাগুলিকে অশান্ত করে রেখে, হুরিয়ত কনফারেন্স এবং জে কে এল এফ-এর মতো সংগঠনগুলির লাগাতার ভোট বয়কটের মুখেও ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভোটাররা ভালো রকম সাড়া দিয়েছেন। বিশেষ করে ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী ৬৫ শতাংশ কাশ্মীরবাসীই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখেই ভোট দিয়েছেন।

এক কথায়, কাশ্মীর সমস্যা মোকাবিলায় নেহরুর জঘন্য পদক্ষেপই প্রধান অন্তরায়। ভারতে প্রধানমন্ত্রী হবার সুবাদে নেহরুর যাবতীয় অপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের দায় এবার নরেন্দ্র মোদীর কাঁধে। কেন্দ্র সরকার কাশ্মীরে ধাপে ধাপে ভারতের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব বদলানোর চেষ্টা শুরু করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে, বিজেপি তার ভিন্ন মেরুতে অবস্থানকারী মেহেবুবা মুফতির পিপলস্ ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে সেখানে সরকার গড়েছে। সরকার প্রথমে বৌদ্ধ, শিয়া ও গুজুর মুসলমানদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘকালীন নীতি নিয়ে চলতে চায়। পরবর্তীতে সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যও একই নীতি অনুসরণ করতে চায় কোনোরকম তোষণনীতি ছাড়াই। ■

বিশেষ নিবন্ধ

মহাকাশে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি

শশাঙ্ক দ্বিবেদী

মহাকাশেও ভারতের গৌরবময় উপস্থিতি আজ বিশ্বের দেশগুলি অবাক হয়ে দেখছে। ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। সেটা এমন একটা সময় যখন মহাকাশে আমেরিকা ও রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। মহাকাশ থেকে আমেরিকা উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর নজরদারি চালাতো। এই নজরদারির কারণেই ১৯৭৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পোখরানে পারমাণবিক গবেষণা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় দেশের প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকরা আমেরিকার স্যাটেলাইটের পরিক্রমার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে তাদের নজরদারি এড়িয়ে পোখরানেই সফল পারমাণবিক পরীক্ষা করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকাকে তখন স্বীকার করতে হয়েছিল যে, ভারতও মহাকাশ গবেষণায় রাশিয়া, আমেরিকার সমকক্ষ হতে চলেছে। আজ ভারত শুধু নিজ দেশের নয়, অন্যদেশের উপগ্রহও অনেক কম খরচে উৎক্ষেপণ করার সামর্থ্য অর্জন করেছে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ইসরো) সম্প্রতি ১৭টি বিদেশি উপগ্রহ-সহ মোট ২০টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে মহাকাশে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণিত করেছে। ইসরো শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পি এস এল ভি সি ৩৪) মহাকাশে পাঠিয়েছে। ২৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে সমস্ত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। উৎক্ষেপিত উপগ্রহগুলিতে কর্টোস্যাট-২ রয়েছে যা পৃথিবীর খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ।

২০০৮ সালে ইসরো প্রথম ১০টি উপগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথে একসঙ্গে উৎক্ষেপণ করে। এবার ২০টি উপগ্রহকে একসঙ্গে মহাকাশে প্রেরণ করে এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। এই উপগ্রহগুলির মধ্যে আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ভারতের ২টি উপগ্রহ রয়েছে। কর্টোস্যাট-২ পর্যায়ের উপগ্রহ আগের কর্টোস্যাট-২, ২এ এবং ২বি-র সমতুল্য। কর্টোস্যাট-২ পর্যায়ের উপগ্রহ ছাড়া অন্য ১৯টির মোট ওজন ৫৬০ কিলোগ্রাম। কর্টোস্যাট-২ উপগ্রহ এবং অন্য ১৯টিকে ৫০৫ কিলোমিটার উচ্চতায় সন সিনক্রোনস্ অর্বিটে স্থাপিত করা হয়েছে। ইসরোর তথ্য অনুযায়ী ২০টি উপগ্রহের মোট ওজন ১ হাজার ২৮৮ কিলোগ্রাম। এই অভিযানে যে উপগ্রহগুলি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার লাপান এ-৩, জার্মানির বিরোস, আমেরিকার স্কাইস্যাট জেন ২-১ এবং জার্মানির এম বি বি রয়েছে।

কর্টোস্যাট-পর্যায়ের উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণের ফলে ভারতের বহু রকমের সুবিধা হবে। এখন দেশের যে-কোনো স্থান মহাকাশ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই উপগ্রহের মাধ্যমে ভারতে কীরূপ ও কত বনাঞ্চল রয়েছে তারও সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। এর সঙ্গেই মহাকাশ থেকে 'হাই রেজোলিশন' চিত্র সংগ্রহ করা সহজ হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, যে-কোনো স্থানের ৬৫ মিটার পর্যন্ত ছবি তোলা যাবে। তোলা ছবি থেকে তাপমাত্রা বিষয়ে জানা যাবে। ভূকম্প, তুফান এবং অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা পাওয়া যাবে। দাবানল নেভানোর কাজ সহজ হবে। সুরক্ষা এজেন্সিগুলিও এর থেকে সহায়তা পাবে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ-সহ দেশবিরোধী কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা যাবে। ভিভিআইপি-দের সুরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে অপরাধসংক্রান্ত গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো, নগর যোজনার বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যাবে।

১৯৬৯ সালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিক্রম সারাভাইয়ের নির্দেশনায় রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গঠিত হয়। তখন থেকে ক্রমাগত গবেষণার ফলে আজ চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন আমরা শুধু চাঁদেই নয়, মঙ্গলেও পৌঁছে গিয়েছি। ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল স্বদেশে নির্মিত উপগ্রহ আর্যভট্টের উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মহাকাশ সফর শুরু হয়। ইসরোর এই সফলতা সেদিন মহাকাশে ভারতের জয়যাত্রার সূচনা করেছিল। ১৯৭৫ সালে মহাকাশে আর্যভট্ট উপগ্রহ প্রেরণ ভারতের প্রথম বড় সাফল্য। এর পর ১৯৮৪ সাল স্কোয়ার্ড্রন লিডার রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে যান। যখন মহাকাশ অভিযান শুরু হয় তখন সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিযোগিতা হোত। সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম উপগ্রহ প্রেরণে সাফল্য পেলে আমেরিকা চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠিয়ে তার জবাব দেয়। কিন্তু ভারতের বিষয় অন্য ছিল। লন্ডনের মহাকাশবিজ্ঞানী ড. এনড্রু কোয়েট্স্-এর বক্তব্য : ‘‘ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৫ বছরের মধ্যেই মহাকাশ গবেষণা শুরু করার পর ক্রমাগত প্রগতির দিকে অগ্রসর হয়ে এমন সাফল্য লাভ করে যে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত দেশের সারিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন ভারতের মহাকাশ যোজনা পরিপক্ক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং সেই সঙ্গে জনকল্যাণের দিশায় এগিয়ে চলছে।”

স্বদেশী স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ

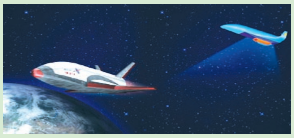

২০১৬-র মে মাসে ইসরো মহাকাশ ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে দু’বার ব্যবহৃত হওয়া মহাকাশ যান আর এল ভি টি ডি-র সফল উৎক্ষেপণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো, উৎক্ষেপণযানকে মহাকাশে নিয়ে গিয়ে উপগ্রহের কক্ষপথে স্থাপন করার পর যেন একটি বিমানের মতো ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। একে বারবার ব্যবহার করা যাবে এবং এর দ্বারা উপগ্রহ প্রেরণের খরচ দশগুণ কম হবে। পরে একে আরও উন্নত করে মানব মিশনেও যুক্ত করা যাবে। মোট কথা, এটি ভারতের পূর্ণ স্বদেশী প্রয়াস এবং সাফল্যের কৃতিত্বও শুধু ভারতের।

মঙ্গলযান ও চন্দ্রযান-১ এর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে শত উৎক্ষেপণের পর সারাদুনিয়া ইসরোর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। চাঁদে জল সন্ধানের কৃতিত্ব চন্দ্রযান-১ কেই দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ইসরো অন্য সব শক্তির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার পথে চলেছে। সুখের কথা, ভারতে প্রভূত পরিমাণে প্রতিভা মজুদ রয়েছে। ভারতের উৎক্ষেপিত উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেতার সম্প্রচার, আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়, চিকিৎসায় টেলিমেডিসিন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কৃষির পূর্বানুমান, ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধান, মৎস্য এলাকার সন্ধান-সহ পরিবেশের ওপরও নজর রাখার কাজ শুরু হয়েছে।

কম উপকরণ ও কম বাজেট সত্ত্বেও ভারত এখন মহাকাশে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। ভারতীয় রকেট উৎক্ষেপণের ব্যয় বিদেশি উৎক্ষেপণ ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ। ইনস্যাট প্রণালীর ক্ষমতাকে জিস্যাট দ্বারা মজবুত করা হচ্ছে। এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যাবে শুধু নয়, সেইসঙ্গে গ্রাম সম্পদ কেন্দ্রগুলিকেও উন্নতমানের তৈরি করা যাবে।

মঙ্গলযান অভিযান

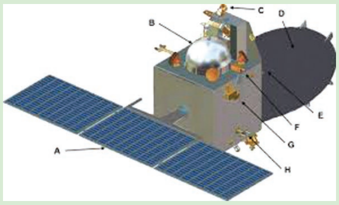

২০১৪-র ২৪ সেপ্টেম্বর ভারত ইতিহাস রচনা করেছে। প্রথমবারেই ভারত মঙ্গলযানকে মঙ্গলগ্রহের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে মহাকাশ ক্ষেত্রে সাফল্যের পতাকা উড্ডীন করেছে। মঙ্গলের কক্ষে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন দেশের ৫১টি অভিযানের মধ্যে ২১টিই সফল হয়। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টাতেই কোনো দেশের সাফল্য এই প্রথম। ভারত এই মিশনের জন্য মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা খরচ করেছে, যা অন্য দেশের তুলনায় খুবই কম। ভারতের আগে মঙ্গল অভিযানে কেবল আমেরিকার নাসা, ইউরোপিয়ান মহাকাশ এজেন্সি এবং আগেকার সোভিয়েত রাশিয়াই সফল ছিল কিন্তু ভারত এখন এই সারির প্রথমে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারত যদি মহাকাশ ক্ষেত্রে এমনই সাফল্য পেতে থাকে তবে সেদিন বেশি দূরে নেই যখন আমাদের মহাকাশ যান মহাকাশ যাত্রীদের চাঁদ, মঙ্গল বা অন্য গ্রহেও নিয়ে যেতে পারবে। ইসরোর বর্তমান অভিযানের সাফল্যগুলি দেশের মহাকাশ গবেষণার মাইলস্টোন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যার ফলে ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে এক মহাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

বেঙ্গালুরুর ইসরো উপগ্রহ কেন্দ্রের নির্দেশক প্রফেসর যশপাল বলেন, ‘‘ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তির ওপর পৃথিবীর আস্থা বেড়েছে। আমেরিকা-সহ বহু উন্নত

দেশ তাদের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ভারত থেকে করছে।”

মহাকাশ বাজারেও বেড়েছে ভারতের গুরুত্ব। একসঙ্গে ২০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করার পর এবং সম্প্রতি স্বদেশী স্পেস শাটলের উৎক্ষেপণের পর সারা পৃথিবীতে ভারতীয় মহাকাশ এজেন্সি ইসরোর জয়জয়কার পড়ে গেছে। এই সাফল্য ২০০ বিলিয়ন ডলারের মহাকাশ বাজারেও সাড়া ফেলে দিয়েছে। কেননা একেবারে কম খরচের জন্য অধিকাংশ দেশ তাদের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করার জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। এখন সময় এসেছে ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার মহাকাশ এজেন্সির মতো ইসরোরও মহাকাশ গবেষণায় আরও বেশি মনোনিবেশ করার। ইসরোকে মহাকাশ গবেষণার জন্য দীর্ঘকালীন রণনীতি তৈরি করতে হবে। কেননা যখন মহাকাশ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে, তখন মহাকাশ গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে। এই কাজের জন্য সরকারকে ইসরোর বার্ষিক বাজেট বাড়াতে হবে। বর্তমানে ইসরোর বাজেট নাসার তুলনায় খুবই কম। বিদেশি ভারী উপগ্রহ বেশি সংখ্যায় উৎক্ষেপণ করার জন্য এখন আমাদের পি এস এল ভি-র সঙ্গে সঙ্গে জি এস এল ভি রকেটও নির্মাণ করতে হবে। পি এস এল ভি প্রয়োগ নৈপুণ্যের জন্য সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বেশি ভারী উপগ্রহের জন্য জি সি এল ভি ব্যবহার করতে হয়।

কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিংহ রাজ্যসভায় বলেছেন, “ভারত এ বছর সাতদেশের ২৫টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে, যাতে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমেরিকার— ১২টি।” উল্লেখ্য যে, ভারত এখন পর্যন্ত পি এস এল ভি-র মাধ্যমে ২১টি দেশের ৫৭টি বিদেশি উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ করেছে। মহাকাশ বাজারে ভারতের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে। ভারত এই ক্ষেত্রে আমেরিকা-সহ কয়েকটি বড় দেশের একাধিপত্য ভেঙেছে। বাস্তবে, তারা আগেই ভেবেছিল যে, এভাবে যদি ভারত মহাকাশে সাফল্য পেতে থাকে তবে তাদের একাধিপত্য বেশিদিন থাকবে না। ভারত মিসাইল নির্মাণেও এমন মজবুত স্থিতিতে পৌঁছে গেছে যে, বড় শক্তিগুলিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। শত্রুর মিসাইলকে আকাশেই ধ্বংস করার ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারসেপ্টর মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ ভারত করেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত ব্যালেস্টিক মিসাইলের প্রতিরোধেও বড় সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। শত্রুর

স্বদেশী জি পি এস-এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন

২০১৬-র ২৮ এপ্রিল ইসরো সপ্তম নেভিগেশন স্যাটেলাইট আই আর এন এস এস-১ জি শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফল উৎক্ষেপণ করেছে। আই আর এন এস এস আমেরিকার গ্লোবাল পোজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস)-এর শৈলী বিষয়ে দিশাসূচক সহযোগিতা করবে। এই পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহের উৎক্ষেপণ ২০১৩-র জুলাই মাসে করা হয়েছিল। ভারতের আই আর এন এস এস পর্যায়ের সাত উপগ্রহ উৎক্ষেপণের এটি অন্তিম ছিল। আই আর এন এস এস আমেরিকার জিপিএস, রাশিয়ার গ্লোনাস, ইউরোপের গ্যালিলিও-র মতো। এই সাফল্যের পর ভারতের কেবল নিজস্ব উপগ্রহ-জাল তৈরি হবে না, বরং দেশের নিজস্ব জিপিএস হয়ে যাবে। এখন জিপিএস-এর জন্য ভারতকে অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। এখন ভারত সেই সব দেশের শ্রেণীতে শামিল হলো যাদের কাছে নেভিগেশন প্রণালী রয়েছে। এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছেই আছে।

মহাকাশে ভারতের জয়যাত্রা

* ২০১৬-র ২২ জুন সকাল ৯.১৫ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পি এস এল ভি-সি ৩৪ এর মাধ্যমে একসঙ্গে ২০টি উপগ্রহের উৎক্ষেপণ।

* এই উপগ্রহগুলির মোট ওজন ১২৮৮ কিলোগ্রাম।

* এর আগে ২০০৮ সালে ইসরো একসঙ্গে ১০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল।

* পি এস এল ভি-সি ৩৪-এর ২০টি উপগ্রহের মধ্যে ১৭টি অন্য দেশের।

* ৩টি উপগ্রহ ভারতের যার মধ্যে কর্টোস্যাট-২ পর্যায়ের উপগ্রহটি ইসরোর নিজস্ব। এর ওজন ৭২৭.৫ কিলোগ্রাম।

* অবশিষ্ট দুটির মধ্যে একটি উপগ্রহ চেন্নাইস্থিত ইসরোর নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। নাম সত্যভামা। আর একটি পুনাস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের। নাম স্বয়ম্।

* ১.৫ কিলোগ্রাম ওজনের সত্যভামা গ্রিনহাউস গ্যাস সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবে।

* পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ১ কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহ রেডিয়ো কমিউনিটি বার্তা প্রেরণ করবে।

* কর্টোস্যাটে বিশেষভাবে যুক্ত করা ক্যামেরাটি ভারতের যে-কোনো ভূগর্ভস্থ পরিবর্তনের ছবি তুলতে সক্ষম।

* নদীর ভাঙন ও পাহাড়ে নামা ধসের বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

* ভারত এক সঙ্গে বেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য আমেরিকা ও রাশিয়ার ক্লাবে শামিল হয়েছে।

* আমেরিকা ২০১৩ সালে ২৯টি এবং রাশিয়া ২০১৪ সালে ৩৩টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল।

* ভারত এখন পর্যন্ত ২০টি দেশের ৫৭টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

ব্যালেস্টিক মিসাইলকে আকাশেই ধ্বংস করার জন্য ভারত সুপারসোনিক ইন্টারসেপ্টর মিসাইল তৈরি করে দুনিয়ার উন্নত দেশগুলির ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন আমেরিকা ভারতে উপগ্রহ উৎক্ষেপণে নিষেধাজ্ঞা লাগিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি বদল হয়েছে। আজ আমেরিকা-সহ সমস্ত দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করতে আগ্রহী। এখন সারা পৃথিবীতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তথ্য ও বেতার সম্প্রচার, আবহাওয়ার আগাম বার্তা এবং দূরসঞ্চার ক্ষেত্র দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এই সমস্ত সুবিধা উপগ্রহের মাধ্যমে সঞ্চালিত হচ্ছে। এজন্য সঞ্চার উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করার চাহিদা দ্রুত বেড়ে চলেছে। যদিও এই ক্ষেত্রে চীন, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশ পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে আছে, কিন্তু এই বাজার এত দ্রুতগতিতে বাড়ছে যে, এর চাহিদা এদের সাহায্যে পূরণ করতে পারা যাচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে ভারতের সম্ভাবনা প্রচুর। কম উৎপাদনমূল্য ও সফলতার গ্যারান্টি ইসরোর সবচেয়ে বড় শক্তি। এর ফলে আগামীদিনে মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের একাধিপত্য কায়েম হবে।

আমেরিকা ২০তম দেশ যারা ব্যবসায়িক উৎক্ষেপণ (Com-mercial Lunch)-এর জন্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মহাকাশ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনুধাবন করা এবং সুদূরবর্তী নভোমণ্ডল গবেষণার সঙ্গে পৃথিবীর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করার উদ্দেশে ভারত আগেই স্পেস অবজারভেটরি অ্যাস্ট্রোস্যাট পি এস এল ভি-সি ৩০-র সফল উৎক্ষেপণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভারতের আগে আমেরিকা, রাশিয়া ও জাপানও স্পেস অবজারভেটরি উৎক্ষেপণ করেছে। বাস্তবে সঠিক পদ্ধতিতে বিদেশি উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণে ভারতের ক্ষমতা বিশ্বমান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমেরিকার ফিউটন করপোরেশনের এক গবেষণা রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে যে, মহাকাশ বিষয়ে বড় বড়

ইসরো'র সাফল্যকে কুর্নিশ

দেশ বিদেশের ২০টি উপগ্রহ মহাকাশে প্রতিস্থাপিত করা ইসরো'র পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। গত জুনের ২২ তারিখে এটি ভারতের ক্যাটোস্যাট-২ সত্যভামা এবং স্বয়ং নামক ৩টি উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে রওনা হয়। ভারত ছাড়াও এই মহাকাশযান সেদিন বিদেশের আরও ১৭টি উপগ্রহকে মহাকাশে নিয়ে যায়। তার মধ্যে ছিল আমেরিকার ১৩টি, কানাডার ২টি এবং জার্মানি ও ইন্দোনেশিয়ার একটি করে উপগ্রহ। ইসরোর এই সাফল্যকে একবাক্যে কুর্নিশ করেছে সারা বিশ্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত ইসরো মোট ১১৩টি উপগ্রহ মহাকাশে প্রতিস্থাপিত করেছে। তার মধ্যে ভারতের ৩৯টি আর অবশিষ্ট ৭৪টি বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের।

ইসরো-র 'আদিত্য'

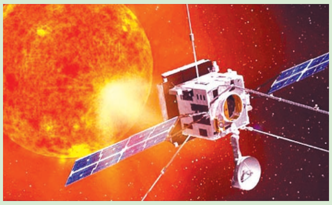

মঙ্গল অভিযান এবং চন্দ্রযান ১-এর সাফল্যের পর এখন ইসরোর বিজ্ঞানীরা 'সান মিশন'-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'সান করোনা' (সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ)-র গবেষণা এবং পৃথিবীতে ইলেকট্রনিক সম্প্রচারে ব্যবধান সৃষ্টিকারী সৌর শিখা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) আদিত্য-১ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে। এটি ২০১২-১৩ সালে করার কথা ছিল। কিন্তু তখন কিছু গবেষণা বাকি ছিল। ইসরোর অধ্যক্ষ এ এস কিরণ কুমার জানান— 'আদিত্য-১-এর উৎক্ষেপণ ২০১৭-২০-র মধ্যে করা হবে।'

আদিত্য ১ উপগ্রহ সোলার করোনোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের সবচেয়ে গভীর ভাগের তথ্য সংগ্রহ করবে। এতে সূর্যের কিরণ, সৌরতুফান এবং বিকিরণ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণের সময়ই সূর্যের অভ্যন্তর ভাগের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এই মিশনের সাহায্যে সূর্যের উপরিভাগের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে। তার ফলে বোঝা যাবে কীভাবে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ প্রণালী এবং সম্প্রচারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ থেকে পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে হওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এর ওজন ২০০ কিলোগ্রাম হবে। এর গবেষণা কাল ১০ বছর। এটি ১৯৯৫ সালে নাসার উৎক্ষেপিত 'সোহো'-র পরে সূর্যের গবেষণায় সবচেয়ে উন্নত উপগ্রহ হবে।

দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারি সব পক্ষের জন্য লাভজনক। এর ফলে বড় পরিমাণ উপকরণ সমানভাবে বন্টিত হয়ে যায়, খরচও কমে। এটা ভারতীয় মহাকাশ উদ্যোগের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণও বটে।

ভবিষ্যতে মহাকাশে প্রতিযোগিতা বাড়বে। কেননা এর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজার রয়েছে। ভারতের প্রথম থেকেই কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। এতে আরও উন্নতি করে আরও বেশি পরিমাণে বাণিজ্যিক লাভ ওঠানো সম্ভব। মহাকাশ বিজ্ঞানে নতুন নতুন গবেষণা করে ভারত উন্নয়নকে আরও গতি দিতে পারে। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন সাকার করতে ইসরোর সাহায্য মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইসরোর মুন মিশন ও মঙ্গল অভিযানের পর এক সঙ্গে ২০টি উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণের ফলে বহু ব্যবসায়িক লাভ হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি স্পেস শার্টলের সাফল্য ইসরোর জন্য সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। ফলে বহু সুবিধা এসে যাবে।

ইসরোর ভবিষ্যৎ মিশন :

মঙ্গলযান ও চন্দ্রযান-১ এর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে শত উৎক্ষেপণ পূর্ণ করার পর ইসরো তিনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ মিশনের কাজ দ্রুতগতিতে করতে চলেছে। এর প্রথম মিশন হলো মহাকাশে মানব প্রেরণ। দ্বিতীয় মিশন, চন্দ্রের উপরিভাগে একটি রোভার নামানো এবং তৃতীয় মিশন হলো সূর্য বিষয়ে গবেষণার জন্য 'আদিত্য' নামের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা। এই সব গুরুত্বপূর্ণ মিশন অগামী চার বছরের মধ্যে কার্যকর করা হবে।

চন্দ্রযান-২ মিশন :

জি এস এল ভি লঞ্চ ভেহিক্যাল দ্বারা

ইসরোর মানবযুক্ত মহাকাশ যোজনা

চন্দ্রযান-১

মঙ্গলযানের সাফল্যের পর ভারতের দৃষ্টি এখন আউটার স্পেসের ওপর। ইসরো গ্রহ সমূহের অনুসন্ধানের জন্য মিশন প্রেরণের যোজনা তৈরি করছে। মোদ্দাকথা হলো, এতে এক মানব মিশনও যুক্ত। এর উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর নিম্নস্থ কক্ষের জন্য দু'টির মধ্যে একটি চালকদল নিয়ে যাবার এবং পৃথিবীতে পূর্ব নির্ধারিত সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তন করার জন্য থাকবে।

পৃথিবী নিম্নস্থ কক্ষ পর্যন্ত মানুষকে নিয়ে যাওয়া এবং সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মানব মহাকাশ উড়ান শুরু করার জন্য এক গবেষণা করা হচ্ছে। দেশের ক্ষমতা নির্মাণ ও প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানব মিশন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কারিগরী ও ব্যবস্থাবিষয়ক গবেষণাও এর অন্তর্গত।

৩০০ কিলোমিটার পৃথিবী নিম্নস্থ কক্ষ পর্যন্ত যাওয়া এবং সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তনের জন্য ২ অথবা ৩ চালকদলের জন্য এক সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বাহনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিছু প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর মহাকাশযান নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। মহাকাশে যাওয়ার জন্য প্রথম এই মানব উড়ানে ২ জন যাত্রী থাকবেন। এই যান মহাকাশে ১০০ থেকে ৯০০ কিলোমিটার উপর যাবে।

ক্রায়োজনিক প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা

২০১৫ সালের ২৭ আগস্ট জি এস এল ভি ডি-৬-য়ের মাধ্যমে অত্যাধুনিক সম্প্রচার উপগ্রহ জি স্যাট-৬-য়ের সফল উৎক্ষেপণের সঙ্গে ভারত পৃথিবীর এমন উজ্জ্বল দেশে পরিণত হয়েছে যার কাছে স্বদেশী ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন রয়েছে। ফলে ভারতকে নিজস্ব ভারী উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

মহাকাশ ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য ইসরোর পুরো টিমকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশ গর্বানুভব করছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষমতা বাড়ছে।

প্রণব মুখার্জী
ভারতের রাষ্ট্রপতি

গত কয়েক বছরে আমরা অন্য দেশের মহাকাশ সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তা করে বিশেষজ্ঞতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছি। একসঙ্গে ২০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, ইসরোর নতুন যোজনার সাফল্যের জন্য আমাদের বিজ্ঞানীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

পি এস এল ভি সি-৩৪ নিজের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে দেখিয়েছে। সবকিছু এমনভাবে হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল আকাশে পাখি ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কিরণ কুমার
চেয়ারম্যান, ইসরো

প্রস্তাবিত এই অভিযানে ভারতে নির্মিত এক লুনার আর্বিটর (চন্দ্রযান), একটি রোভার এবং একটি ল্যান্ডর সম্মিলিত হবে। ইসরোর বক্তব্য অনুসারে, এই অভিযানে বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হবে এবং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগও করা হবে। চাকাওয়ালা রোভার চাঁদের উপরিভাগে চলতে থাকবে এবং পরীক্ষার জন্য মাটি অথবা পাথরের টুকরো নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করবে। পরিসংখ্যানগুলিকে চন্দ্রযান-২ অর্বিটরের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। এই অভিযান শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে 'জিয়োসিংক্রোনস্ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল এম কে-২' মাধ্যমে প্রেরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। উড়ানের সময় এর ওজন প্রায় ২৬৫০ কিলোগ্রাম হবে।

আর্বিটরটি ইসরোর বিজ্ঞানীরা ডিজাইন করবেন এবং এটি ২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় চাঁদকে পরিক্রমা করবে। এই অভিযানে আর্বিটরকে পাঁচটি পেলোডের সঙ্গে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনটি পেলোড নতুন, কিন্তু অন্য দু'টি উন্নত সংস্করণের। চাঁদের উপরিভাগের সংঘর্ষ হওয়া চন্দ্রযান-১ এর লুনার প্রোবের উলটো দিকে ল্যান্ডার ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাবে। ল্যান্ডর ও রোভারের ওজন প্রায় ১২৫০ কিলোগ্রাম হবে। রোভার সৌরশক্তি দ্বারা সঞ্চালিত হবে। রোভার চন্দ্রপৃষ্ঠের ওপর চাকার সাহায্যে চলবে। মাটি ও পাথরের টুকরো নমুনা হিসেবে একত্রিত করবে, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে এবং তথ্য উপরে আর্বিটরের কাছে পাঠাবে। সেখান থেকে তা পৃথিবীর কেন্দ্রে পাঠানো হবে। প্রথমে এই অভিযান ইসরো এবং রাশিয়ার মহাকাশ এজেন্সি (রোসকোসমোস) দ্বারা যৌথভাবে করা হচ্ছিল। তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আর্বিটর ও রোভারের মুখ্য দায়িত্ব ইসরোর থাকবে এবং ল্যান্ডারের দায়িত্ব রোসকোসমোসের থাকবে। কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, অভিযানের পুরা দায়িত্ব সামলাবে ইসরো-ই। আর ইসরো আর্বিটর, রোভার ও ল্যান্ডার— তিনটিই বানাবে।

(লেখক রাজস্থানের মেবাড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের উপনির্দেশক)

ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন (ইসরো)

* ১৯৬২ সালে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিক্রম সারাভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা সমিতি গঠন করা হয়।
* ১৯৬৫ সালে থুম্বায় মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারিগরী সংস্থা (এস এস টি সি) স্থাপিত হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম রকেট উৎক্ষেপিত হয়েছিল।
* ১৯৬৯-এর ১৫ আগস্ট ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) গঠিত হয়।
* ১৯৭২ সালে সরকার কেন্দ্রীয় স্তরে এক মহাকাশ বিভাগ গঠন করে।
* ১৯৭৫ সালের ১ এপ্রিল কেন্দ্র সরকার ইসরোকে সরকারি মান্যতা দেয়।
* ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় প্রেরণ করা হয়।
* আর্যভট্টের পর ইউরোপিয় দেশগুলির সাহায্যে ১৯৭৭ সালে ভারত স্যাটেলাইট টেলিকমিউনিকেশন প্রকল্প শুরু করে।
* ১৯৭৯ সালের ৭ জুন গবেষণার জন্য ভারতের উপগ্রহ ভাস্কর-১ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়।
* ১৯৭৯ সালের ১০ আগস্ট এস এল ভি-৩ লঞ্চার পরীক্ষামূলকভাবে প্রেরণ করা হয়।
* ১৯৮১ সালের ৩১ মে আর এস-ভি-১ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। ১৯ জুন এপ্পল নামে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। নভেম্বরে ভাস্কর-২ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়।
* ১৯৮২-র ১০ এপ্রিল ইনস্যাট-১ এ-র উৎক্ষেপণ। '৮৩ সালে এস এল ভি-৩ এবং আর এস ডি-২-এর উৎক্ষেপণ।
* ইনস্যাট-১-রি উৎক্ষেপণের সঙ্গেই ইনস্যাট প্রযুক্তি সর্বমান্যতা লাভ করে এবং ১৯৮৪ সালে ইনস্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রচারের সুবিধা যুক্ত হয়েছে।
* ১৯৮৭-র ২৪ মার্চ রোহিণী উপগ্রহ পর্যায়-১ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। পরের বছর ১৯৮৮ সালে রিমোট সেনসিং-এর ক্ষেত্রে বড় সম্ভাবনা দেখা যায়। আই আর এস-১-এ-র উৎক্ষেপণ এবং রিমোট সেনসিং সিস্টেম স্থাপন করতে ভারত সফল হয়। ওই বছর ২২ জুলাই ইনস্যাট-১-সি-ও মহাকাশে প্রেরণ করা হয়।
* ১৯৯০-এর জুনে ইনস্যাট-১-ডি-র উৎক্ষেপণ।
* ১৯৯২-এর ১০ জুলাই ইনস্যাট-২-ই-র উৎক্ষেপণ।
* ১৯৯৩-এ ইনস্যাট-২বি, আই আর এস-১ই এবং ১৯৮৪ সালে আই আর এস-পি-২, উৎক্ষেপণ।
* ১৯৯৫ এর ৭ ডিসেম্বর ইনস্যাট-২ সি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ।
* ১৯৯৭ সালে ইনস্যাট ২ ডি এবং ১৯৯৯ সালে ইনস্যাট ২ই-র উৎক্ষেপণ। ভারত এসময় থেকে বিদেশের উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কাজ শুরু করে।
* ২০০১-এ ভারত পি এস এল ভি-৩সি উন্নত করে উৎক্ষেপণ করে। ২০০১ এ-ই ইনস্যাট ৩ সি, কম্পনাল উপগ্রহের উৎক্ষেপণ। ২০০৩-এ ইনস্যাট ৩এ এবং ৩ই উৎক্ষেপণ করা হয়।
* ২০০৭ পর্যন্ত একসঙ্গে সর্বাধিক ৮টি উপগ্রহ প্রেরণে প্রথম সারিতে নাম ছিল রাশিয়ার। ২০০৮ সালের ২৮ এপ্রিল ভারত একসঙ্গে ১০টি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে।
* ২০০৮-এর ২২ অক্টোবর ভারত মহাকাশে প্রেরণ করে মানবরহিত চন্দ্রযান।

চিঠিপত্র

২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের সমাবেশ

ধর্মতলায় মমতা ব্যানার্জির ২১ জুলাইয়ের ভাষণে কেন্দ্র বিরোধী, হিন্দু বিরোধী, দেশ বিরোধী ও নির্বাচন কমিশন বিরোধী বক্তব্য মিথ্যাচার ও শঠতায় পরিপূর্ণ ছিল।(১) কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গিয়ে মমতা বলেন, কেন্দ্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তিনি প্রমাণ দিয়ে বলুন কী সেই চক্রান্ত। (২) কেন্দ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে মমতা বলেন, 'ওরা টাকা ছাপাচ্ছে আর কেউ ওদের পলিসির বিরোধিতা করলে মিথ্যা সিবিআই আর ইডি লাগাচ্ছে।' তাহলে মমতা কি রাজ্যে রাজ্যে টাকা ছাপানোর অধিকার চাইছেন? কেন্দ্র কোন কোন বিষয়ে আর কার কার বিরুদ্ধে মিথ্যা সিবিআই আর ইডি লাগিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বলুন। (৩) রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্যের ৬০০ শতাংশ উন্নয়ন হয়েছে। এই কথার ভিত্তি কী? আর পরিকাঠামোর যা উন্নয়ন হয়েছে, আগামী ৬০০ বছর তা রাজ্যের অ্যাসেট হয়ে থাকবে, এই দাবিও মমতা করেছেন। দিকে দিকে ব্রিজ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, গ্রামীণ রাস্তা আর সেতু ভেঙে পড়ছে। তিনি যা করেছেন তা ৬০০ বছর রাজ্যের অ্যাসেট হয়ে থাকবে, এই দাবি হাস্যকর। (৪) নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে বলেন, কমিশন নির্বাচনের নামে কার্গিল করে দিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বক্তব্যের মাধ্যমে মমতা নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা, তৎপরতা ও ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং কার্গিল বিজয়ের মতো গর্বের বিষয়টিকে তিনি হীন চোখে দেখতে চেয়েছেন।(৫) মমতা মানুষের খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতা নিয়ে প্রকারান্তরে গোহত্যাকে বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের দাদারিতে মোহাম্মদ আখলাখ নামের এক ব্যক্তির দুঃখজনক মৃত্যুর পর দেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সার্বজনিক গোমাংস ভক্ষণের উৎসব শুরু হয়। শেষে ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা যায় আখলাখের পরিবার সেদিন গোমাংস রান্না করেছিল। উত্তরপ্রদেশে গোহত্যা নিষিদ্ধ। তাই এখন সেখানকার সমাজবাদী সরকারের পুলিশ মৃত আখলাখ ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশি মামলা রজু করেছে। সেটা উত্তরপ্রদেশের ব্যাপার। আর কে কী খাবে সেটা নিশ্চয় আইন মেনে নিজের রুচি অনুযায়ী করা উচিত। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি শুধু গোরু ছাগল ও মুরগির মাংসের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখছেন কেন? কেন তিনি একবারও শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা বলছেন না? সম্প্রতি নাগাল্যাণ্ডে কুকুরের মাংস খাওয়া সেখানকার সরকার বন্ধ করেছে। কেন তিনি তার বিরোধিতা করছেন না? আসলে তিনি সেই পক্ষের মানুষদের সমর্থন করছেন যারা গোমাংস ভালোবেসে আইন ভেঙে গোহত্যা করে আর শুয়োরের মাংসকে হারাম ভাবে। এটা সকলকে সমান ভাবে দেখার রাজধর্ম পালন নয়। মমতা মুসলমানদের খুশি করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করছেন। (৬) মমতা হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তা ও গোরক্ষা কার্যকর্তাদের প্রকারন্তরে হুমকি দিয়েছেন। এতে ওই কার্যকর্তারা ভয় পাবেন, না সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মমতা ও তৃণমূলের হিন্দু বিরোধিতার মোকাবিলা করবেন সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ নং ধারাতে পরিষ্কার ভাবে গোবংশ রক্ষার নির্দেশ আছে। সুতরাং যদি কেউ বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোরক্ষা ও গো-সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাতে তারা মহান সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তাদের দাবিয়ে রেখে মমতা কি সংবিধানের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে চান? (৭) হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তাদের প্রকারন্তরে ধমক দিলেও কিন্তু তিনি এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান জেহাদি ও জঙ্গি ইসলামি সংগঠনের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেননি। তিনি সঙ্ঘ পরিবারের গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিলেন। কিন্তু এই বাংলায় ক্যানিং, দেগঙ্গা, উস্থি, সমুদ্রগড়, কালিয়াচক, খাগড়াগড় কেন ঘটছে, সে ব্যাপারে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সবুজ রং এতো ভালোবাসেন যে তাঁর পার্টির মধ্যেই সবুজ দাড়ি, সবুজ জামাকাপড় পরে অজস্র জেহাদি ঘোরাফেরা করছে। তার এই দ্বিচারিতা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। (৮) মমতা সুচতুরভাবে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কবির সুমনকে দিয়ে একজন জামিন না পাওয়া অপরাধী মদন মিত্রের প্রশংসা করিয়েছেন। নিজের বক্তব্যে মমতা সে বক্তব্যের খণ্ডনও করেননি। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূল ভালো-খারাপ, নীতি-দুর্নীতি, সাধু-আর চোরের ফারাকটা ঘুচিয়ে দিতে চাইছেন। শর্ত শুধু তৃণমূল করলেই হবে। (৯) এদিন মমতার মঞ্চ থেকে কবির সুমন আর একটি ভয়ঙ্কর ঘোষণা করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে দলিত-মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বলেছেন আর 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যে-সেনগুপ্ত-দাসগুপ্ত'দের কটাক্ষ করেছেন। মমতা ব্যানার্জি তার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চকে নোংরা জাতপাতের রাজনীতি করার আখড়ায় পরিণত করেছেন।(১০) সততার প্রতিমূর্তি সাজতে গিয়ে তিনি নিজের ঢাক নিজে পিটিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বলেছেন, 'ভাত দেয় না, কিল মারার গোঁসাই'—'চোরের মার বড় গলা'। মমতা এখন সিন্ডিকেটের কিছু নেতাকে লোক দেখানো গ্রেপ্তার করছেন। লোকে এসব ধরতে পারছে। ২১ জুলাইয়ের প্রোগ্রামে যে ৫ কোটি টাকা খরচ হলো, সে টাকা দিলো কে? সিন্ডিকেটের ডনরা কি এর জন্য টাকা দেয়নি? সৎ সাহস থাকলে মমতা বলুন, ২১ জুলাই ২০১৬-তে একদিন রাজ্যের জনজীবনকে ব্যাহত করে, উন্নয়ন স্তব্ধ করতে তিনি ঠিক কত টাকা খরচ করলেন আর তার উৎস কি?

২১ জুলাই ২০১৬-এর ধর্মতলার তৃণমূলের শহিদ স্মরণের সমাবেশ তাই

আমার চোখে পশ্চিমবাংলার বাঙালি হিন্দুদের শহিদ করে ফেলার এক সুগভীর ষড়যন্ত্র।

—**উপানন্দ ব্রহ্মচারী,**
চেমাগুড়ি, গঙ্গাসাগর।

শক্তির আধার সূর্যদেব

গত ১৩ জুনের পত্রিকায় ড. ধনঞ্জয় রায়ের ‘ভূ-জ্বর সারাতে কবিরাজ সূর্য’—লেখাটি পড়লাম। লেখাটিতে বলা হয়েছে— ‘আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এমন এক বিদ্যুৎ শক্তির উৎস যা হবে স্থায়ী (অন্তত দীর্ঘস্থায়ী) এবং দূষণমুক্ত।’ পরে পারমাণবিক শক্তির কথা বলতে গিয়ে লেখক বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি নিরাপদ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। সৌরশক্তি তথা সৌরবিদ্যুৎ বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে লেখক পরমাণুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কেন বোঝা গেল না।

‘প্রত্যেক বস্তু অতি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রকণা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত।’ এবং ‘আইনস্টাইনের ভরশক্তি সূত্র $E=mc^2$’— লেখকের এ দু’টি বক্তব্য বৈশেষিক দর্শনের প্রবক্তা কণাবিদ বিজ্ঞান সাধক ঋষি কণাদের অজানা ছিল না। অথচ তিনি কোথাও পারমাণবিক বিদ্যুতের উল্লেখ করেননি। বিজ্ঞান সাধক ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর বিমান শাস্ত্রম্ গ্রন্থে জ্বালানি হিসাবে অনিরাপদ পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার করেননি। ১৪শ শতাব্দীর অগস্ত্য সংহিতা গ্রন্থে সৌরবিদ্যুৎসহ উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও পারমাণবিক বিদ্যুতের উল্লেখ নেই।

‘সূর্যকে নিয়ে কৌতূহল বা বিস্ময় কেবল আজকের নয়, প্রাচীনকালেরও।’’ —লেখকের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমিও সহমত। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পত্রের মাধ্যমে সেই কৌতূহল ও বিস্ময়ের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তবু লেখকের ব্যাখ্যা ভিত্তি করে কিছু তথ্য সঙ্কেত নিবেদন করছি।

ইং ১৭৭৯ সালে ডাচ পদার্থবিদ জন ইন্‌জেনহাউজ-এর পরীক্ষালব্ধ যে তথ্য লেখক তুলে ধরেছেন তার বহু সহস্র বছর পূর্বে অথর্ববেদের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে প্রচুর পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান হয়েছে। অথর্ববেদে দক্ষবায়ু (অক্সিজেন), ব্যন্যবায়ু (কার্বন-ডাই- অক্সাইড) ভেদে প্রকৃতিতে দ্বিবিধিবায়ুর উল্লেখ আছে। দক্ষবায়ুকে পরবর্তীকালে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্য গ্রন্থে বিষ্ণুপদামৃতম বলা হয়েছে। ক্লোরোফিল ও সালোকসংশ্লেষের কথা প্রাচীন ভারতের অজানা ছিল না। এ তথ্য মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, চরকসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ড. রায় বলেছেন— ‘আলোকশক্তি যে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তা প্রথম পরীক্ষাগারে দেখেছিলেন ১৮৩৯ সালে বিজ্ঞানী বেকয়রেল্।’ এ সম্পর্কে বলা যায়, সূর্য বল ও শক্তির উৎস— এ তথ্য বৈদিক সমীক্ষায় পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এর উল্লেখ আছে। সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয়— একথা বৃহৎ বিমান শাস্ত্রম্, ক্রিয়াসার তন্ত্রম্ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। পূর্বে অগস্ত্য সংহিতায় সৌরবিদ্যুতের উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্যশক্তি নিয়ে প্রাচীন ভারতে প্রচুর অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ হয়েছে। তাই তৈত্তিরীয় সংহিতায় মহাবিশ্বে সূর্যকে এক আকর্ষণীয় শক্তির আধার বলা হয়েছে। বরণীয় জ্যোতির্ময় সূর্যদেবকে ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতায় পিতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। লেখকের সঙ্গে তাঁকে আমরাও প্রণাম জানাই।

—**কবিরাজ ড. চন্দন পাত্র,**
প্রণবপল্লী, রামপুরহাট, বীরভূম।

রহস্যময় শৌলমারি আশ্রম

প্রায় ৬০ বৎসর পর নতুন করে শৌলমারি আশ্রমের সাধুর বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর তদন্ত শুরু করেছেন। দীর্ঘ এত বৎসর পর কী এমন ঘটল, পুনরায় তদন্তের প্রয়োজন দেখা দিল? শৌলমারি আশ্রমের সাধুকে এলাকার সাধারণ মানুষ ‘নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস’ বলেই মনে করতেন। সাধু নেতাজী এই প্রচার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধু নিজেকে ‘সারদানন্দ’ বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। কে এই সারদানন্দ? তিনি কোথা থেকে এসে শৌলমারিতে আশ্রম খুললেন? কী তাঁর পূর্ব পরিচয়? আসল নাম কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। সাধু কী উদ্দেশেই বা এসেছিলেন? কেনই বা আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন, কোথায় গেলেন এইসব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে। আসাটাই স্বাভাবিক।

সারা দেশ যখন শৌলমারি আশ্রম নিয়ে তোলপাড় তখন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গোয়েন্দারা আশ্রমে নজরদারি চালিয়েছিলেন। নজরদারি করে গোয়েন্দারা কী পেয়েছিল তা দেশের মানুষ জানতে পারেনি। অর্থাৎ দেশের জনগণকে জানতে দেওয়া হয়নি। এখানেই লুকিয়ে আছে ‘রহস্য’। আশ্রমের কার্যকলাপ দেখে এলাকার মানুষজন অবাক হতেন। সরকার আশ্রমের বিষয়ে খুব সাবধানী ছিলেন। তাই, সাধুকে বিরক্ত বা গ্রেপ্তার অথবা আশ্রমে ঢুকে কোনো তদন্ত করেননি। সাধু যেভাবে আশ্রম চালাচ্ছিলেন সরকার তাতে বাধা দেননি। সরকারের উচিত ছিল তদন্ত করে সঠিক তথ্য জনসম্মুখে তুলে ধরা। সরকারের এই নীরবতা সন্দেহের কারণ, কে এই সাধু?

শৌলমারি আশ্রম নিয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে একটি মামলা হয়েছিল। ওই মামলায় নেতাজী অন্তর্ধানে সাহায্যকারি আইনজীবী ছিলেন— নেতাজীর ব্যারিস্টার ভাইপো। মামলার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ জানে না। ওইদিন আশ্রমে সকলের জন্য ‘কৈ মাছের’ পাতুরি রান্না করা হয়েছিল। কারণ ভাইপো কৈ মাছ খেতে ভালবাসতেন। মাথাভাঙ্গা মহকুমার আইনজীবীগণ শ্রীবসুর নিকট সাধু ও আশ্রম বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে শ্রীবসু বলেছিলেন আজকে যে সওয়াল করলাম— তা আশ্রমের সাধুই বলে দিয়েছিলেন। মাথাভাঙ্গা আদালতে খোঁজ নিলেই মামলার বিষয়বস্তু বিস্তারিত জানা যাবে।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ী, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

ঢাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী

রমনা কালীবাড়ি

বরুণ দাস

একাত্তরের কালোদিন

ঢাকা মহানগরের বিখ্যাত রমনা ময়দানের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলেন সিএনজি-র বর্ষীয়ান চালক। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম কালীবাড়ির সামনে। বিকেল গড়িয়ে তখন ঢাকা মহানগরের বুকে সবে সন্ধ্যা নেমেছে। সেই সন্ধ্যা গায়ে মেখে আমরা ঢুকে পড়ি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। ঢাকেশ্বরী, বাদরি ও রমনা কালীবাড়ি দর্শন করে আমরা ধন্য হলাম।

'আমাদের' বলতে বারাসাত-নিবাসী সফরসঙ্গী ষাটোর্ধ স্বরাজকুমার দত্ত, ঢাকায় আমাদের তরুণ গাইড তথা বাংলার ভূমিপুত্র মাণিক চৌধুরী এবং এই প্রতিবেদক। উল্লেখ্য, ঢাকায় আমাদের ট্যুর সিডিউল তৈরি করে দিয়েছিলেন 'স্যার' তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাংলাদেশস্থ শাখা-সমূহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট শিক্ষাজীবী অরুণচন্দ্র দাস। তিনিই মাণিক চৌধুরীকে গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দিনটি বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে কালোদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ওইদিন রমনা কালীবাড়ি খুব নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা হয়। ঐতিহাসিক রমনা কালীবাড়ি শুধু বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের হিন্দুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র স্থান। মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাস বলে, ১২০০ বছর আগে এই কালীমন্দির স্থাপিত হয়।

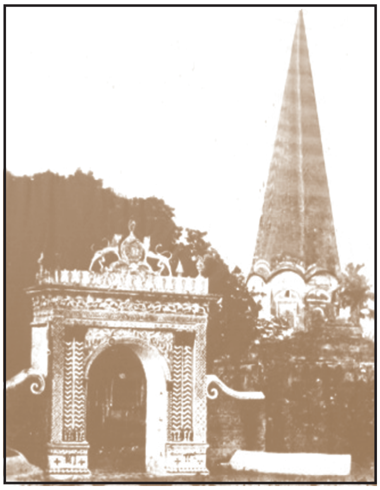

সাবেক রমনা কালীবাড়ি, ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী এটি ধ্বংস করে।

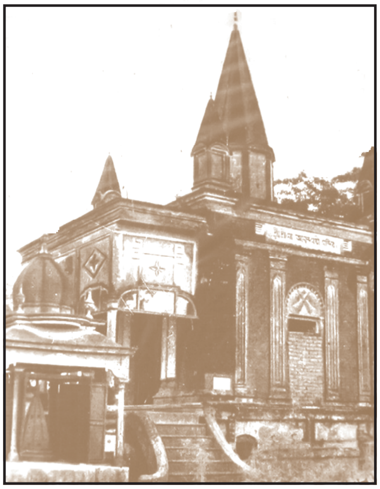

শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম। এটিও একই সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২৬ একর জমির ওপর রমনা কালীমন্দির। এরই একাংশে রেসকোর্স ময়দান। বর্তমানে যার নতুন নাম সোরওয়ার্দি উদ্যান। উল্লেখ্য, কোনো জাতি বা দেশের ঐতিহ্য তার ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও সমান সম্পৃক্ত। কোনো দেশের সরকার তার ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলি রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার সেগুলি ধ্বংস করতে ব্যস্ত। এমনই অভিযোগ মন্দির কর্তৃপক্ষের।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, বাংলাদেশ সরকার গঠন হওয়ার পর সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন— পাকসেনার হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের জন্য। তিন মাসের মধ্যে রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন শেখ সাহেব। কিন্তু স্বাধীন দেশের 'প্রগতিশীল সরকার' রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় রমনা কালীবাড়ি। ফলে মন্দিরের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর হয়। এখানেই শেষ নয়, যাঁরা রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দিরের জমি আওয়ামি লীগ সরকার ছিনিয়ে নেয়। সংসদে একটি নতুন বিল পাশ করে মন্দিরের বিশাল জমি রাতাতাতি রেসকোর্সের মাঠে রূপান্তরিত করা হয়।

রমনা থানা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এই ঐতিহাসিক কালীমন্দির। ইতিহাসকে গায়ের জোরে অস্বীকার করলেই কি সে তার বাস্তবতা হারায়? প্রকৃত ঘটনা হলো, অনেক পরে রমনা থানা এবং রমনা পার্কের নামকরণ হয়। পুরনো দলিল-দস্তাবেজ খুঁজলেই এর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার নাছোড়বান্দা হলে সংখ্যালঘু মানুষের উপায় কী!

মন্দিরে কালীমাতার বিশাল মূর্তি। তার পাশের মন্দিরে সপরিবারে মা দুর্গা। তার পাশে আনন্দময়ী মায়ের মন্দির ও মূর্তি। আরও কিছুটা ডানে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মূর্তি ও মন্দির। ফরিদপুর জেলার ওরাকান্দিতে যাঁর আদি পীঠস্থান। তবে রমনা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে আনন্দময়ী মা আর মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ-

গুরুচাঁদের মূর্তি ও মন্দির যেন কিছুটা বেমানান। প্রাচীন ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সহাবস্থানে কেমন যেন খটকা লাগে। পুরাণ ও ইতিহাস যেন কেমন গুলিয়ে যায়।

কালীবাড়ির পুরনো ইতিহাস

রমনা কালীবাড়ির পুরনো ইতিহাস বলে, এখনকার কালীমন্দির হাল-আমলের। এই ঐতিহাসিক মূল মন্দির আগে দোতলা বাড়ি ছিল। দোতলার মাঝের ঘরে দেবী ভদ্রকালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। আর দেবী ভদ্রকালীর ডানদিকে ভাওয়াল কালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ওপরে দক্ষিণদিকে ছিল প্রশস্ত বারান্দা। ঠিক তার পরেই ছিল দেবীর মূল মন্দির।

পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে পর পর সারিবদ্ধভাবে ভক্তদের থাকার ঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতল বাড়ির অন্য তলের পূর্বদিকে ছিল দু'টি রান্নাঘর। যার একটিতে সাধারণ নিরামিষ ও অন্যটিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ অন্ন-প্রসাদ তৈরি করতেন মন্দিরের স্থায়ী পাচকেরা। মন্দির-বাড়ির গঠন-পদ্ধতি এমনই নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল যে, দূর থেকে এসব সহজেই দেখা যেত।

এছাড়াও বিশাল প্রবেশদ্বারের কাছে ছিল একটি বড়ো মাপের নাটমন্দির। গেটের বাইরে দু'দিকে ইটের সুন্দর বেঞ্চ ছিল যাতে ভক্তরা আরামে বসতে পারেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বাঁদিকে ছিল আর একটি একতলা বাড়ি। এর অনতি-দূরেই ছিল দশনামা শিবমন্দির। এর কাছেই আবার প্রশস্ত শান-বাঁধানো জায়গা ছিল। মূল মন্দিরের কাছেই শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকে আরও দু'টি পাকা বাড়ি। মন্দির ও উঠানের চারদিক উঁচু প্রাচীর বা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। মন্দিরের উঠোন সংলগ্ন স্থানে স্ত্রী ও পুরুষদের থাকার জন্য আরও দু'টি পাকা বাড়ি ছিল। এই দুই বাড়ির মাঝখানে একটি দেওয়াল ছিল যার ভিতরকার দরজা দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি সহজেই যাতায়াত করা যেত। আর প্রাঙ্গণের প্রশস্ত ভূমিতে ছিল মূল্যবান সব গাছগাছালি।

: Ranadipam Basu's Photography :

বর্তমানে মন্দিরের বিগ্রহ

হরিদ্বারের গিরিরাজ গোস্বামী

হরিদ্বারের গিরিরাজ গোস্বামীর মতে, রমনা কালীবাড়ি মন্দির নির্মাণ করেন বাংলার রাজা শশাঙ্ক শূর। এই অঞ্চলের দু'দিক দিয়ে মেঘনা-যমুনা প্রবাহিত হতো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তদের দ্বারা এই ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দির উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজা, ভবানীর রানি সহ আরও অনেক রাজা ও জমিদার এই মন্দিরের প্রয়োজনীয় সারাই ও সংস্কার করেছেন। এই মন্দিরের ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকেরা দেব-দেবীর সেবাকাজেই শুধু নিজেদের যুক্ত রাখেননি, দেশের কাজের জন্যও তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে এঁদের গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। সন্ন্যাসীরা ছিলেন স্বাধীনতাকামী মানসিকতার। তাঁরাই এখানে শাসন করতেন। অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত জাগ্রত দেবীর কৃপালাভের জন্য এখানে আসতেন।

মন্দিরের ইতিহাস বলে, স্বামী প্রেমানন্দগিরি এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই পণ্ডিত-প্রবর আধ্যাত্মিক মানুষটি অত্যন্ত উদার ও উচ্চ মনের ছিলেন। কোনো রকম সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর কাছে সমান ছিলেন। এই মন্দিরটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মন্দিরের ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, মন্দিরের অন্য ভক্তদের কথা অগ্রাহ্য করে অধ্যক্ষ মহারাজ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। পাকসেনারা খবর পেয়ে ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মন্দিরে হানা দেয় এবং ২৫ মার্চের পর ইউনিভার্সিটি চত্বরের সমস্ত মানুষ জীবন বাঁচাতে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই ভেবে যে, পাকসেনারা এই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করবে না। কিন্তু পাকসেনারা চারদিক থেকে মন্দির ঘিরে ফেলে এবং আবাসিকদের ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে নির্দেশ দেয়। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করায়। মন্দিরের অধ্যক্ষকে চিহ্নিত করে তাঁর মাথা ও পেট গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

এবার বর্বর পাকসেনাদের হাতের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ঘুরে যায় কালীমন্দিরের বাকি নিরপরাধ ও নিরস্ত্র আবাসিকদের দিকে। তাদের সবাইকেও নৃসংশভাবে হত্যা করে। এরপর তারা কালীমন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আকাশ-চুম্বী মন্দির চূড়ো সেই আগুনে পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এভাবেই বারশো বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে যায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বিগ্নতা

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঐতিহ্য রক্ষণ বিভাগ এ খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বার্তা পৌঁছয় পাকিস্তানেও। পাকসেনার বর্বরোচিত আচরণে দুঃখ প্রকাশ করেন পাকিস্তানের উঁচুমহলের কর্তাব্যক্তিরা। প্রতিশ্রুতি দেন মন্দির পুনর্গঠনের। কিন্তু স্বাধীন দেশের আওয়ামি লীগ সরকার বুলডোজার দিয়ে রমনা কালীমন্দির সম্পূর্ণভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যে কাজটি করে তার কোনো প্রতিকার হয়নি আজও। বর্তমানে সাদামাটা শেডের নীচে বড়ো মাপের কালীমূর্তি। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম তাঁরই সামনে। যে ইতিহাসের পাতা উলটানো হলো এতোক্ষণ, তা শুধুই ধ্বংসের। একদল নির্মাণ করেন, আর একদল ধ্বংস করে। আফগানিস্তানের হিংসাদীর্ণ তালিবানি ইতিহাস কখনো কখনো আমাদের সভ্যতার চাকা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ■

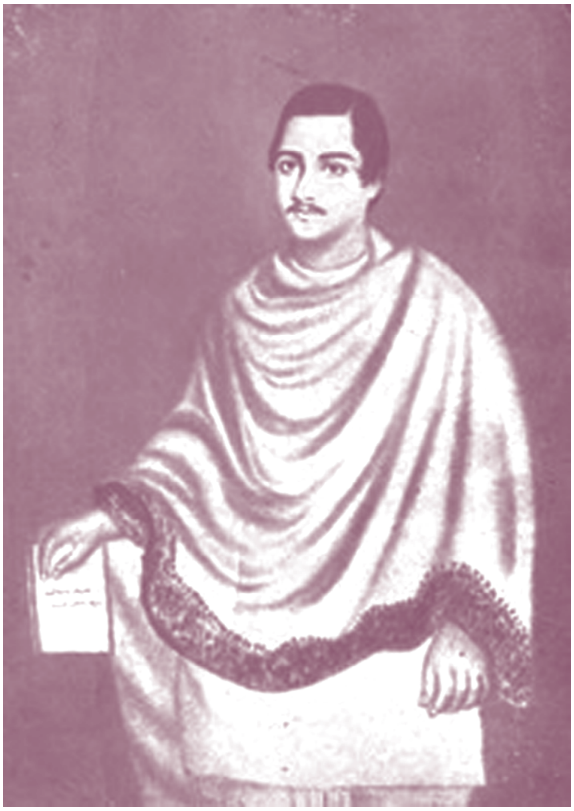

বাংলার নবজাগরণের নায়ক কালীপ্রসন্ন

রূপশ্রী দত্ত

উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পুরোধারূপে আমাদের দেশে একদল মনীষী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে— সমাজতত্ত্ব, ধর্মচেতনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪১ এবং মৃত্যু ২৪ জুলাই ১৮৭০। তিনি ছিলেন সুলেখক, নাট্যকার ও মানবপ্রেমিক। তিনি মূল সংস্কৃত থেকে বাঙালায় মহাভারত অনুবাদ করেন। এছাড়া, তখনকার কলকাতার নাগরিক সমাজকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখেন। ‘হুতোম প্যাঁচা’ ছদ্মনামে রচনার নামকরণ করেন হুতোম প্যাঁচার নক্শা। তাঁর ছিল সহানুভূতিপূর্ণ একটি মানবিক মন। বহু দুঃস্থ ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করতেন।

তিনি জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারে। মাত্র ছ’ বছর বয়সেই কালীপ্রসন্ন পিতৃহীন হন। বাবু হরচন্দ্র ঘোষ নামক এক অ্যাটর্নী তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনেও তিনি বহুমুখী গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। নিতান্ত শৈশব থেকেই তিনি মাত্র একবার দেখা বা শোনা বিষয় মনে রাখতে পারতেন।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ নামে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫৪ সালে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু সেই বিবাহিত জীবন খুবই স্বল্পস্থায়ী ছিল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা ও প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী শরৎকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

তিনি হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) পড়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলেজ ত্যাগ করে বাড়িতে বাংলা ও সংস্কৃত পড়েছিলেন। ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে বাড়িতে তিনি ইংরেজিও পড়তেন।

এইভাবে কালীপ্রসন্ন নিজেকে লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, সমাজকর্মী ও সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে তাঁর সহকর্মী ছিলেন রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে তাঁর বাড়িতে ‘শকুন্তলা’, ‘বেণীসংহার’ ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয়েছিল। ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকও অভিনীত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান মধুসূদন দত্তকে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য প্রশংসাপত্র ও রৌপ্যপাত্র প্রদান করেছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সেইসময়’ উপন্যাসে কালীপ্রসন্নের আদলে নবীনকুমার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের নায়ক কালীপ্রসন্নকে এইভাবে তিনি চিরন্তন করে রেখেছিলেন। ▮

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ইতিহাসের গল্প

জব্দ হল শায়েস্তা খাঁ

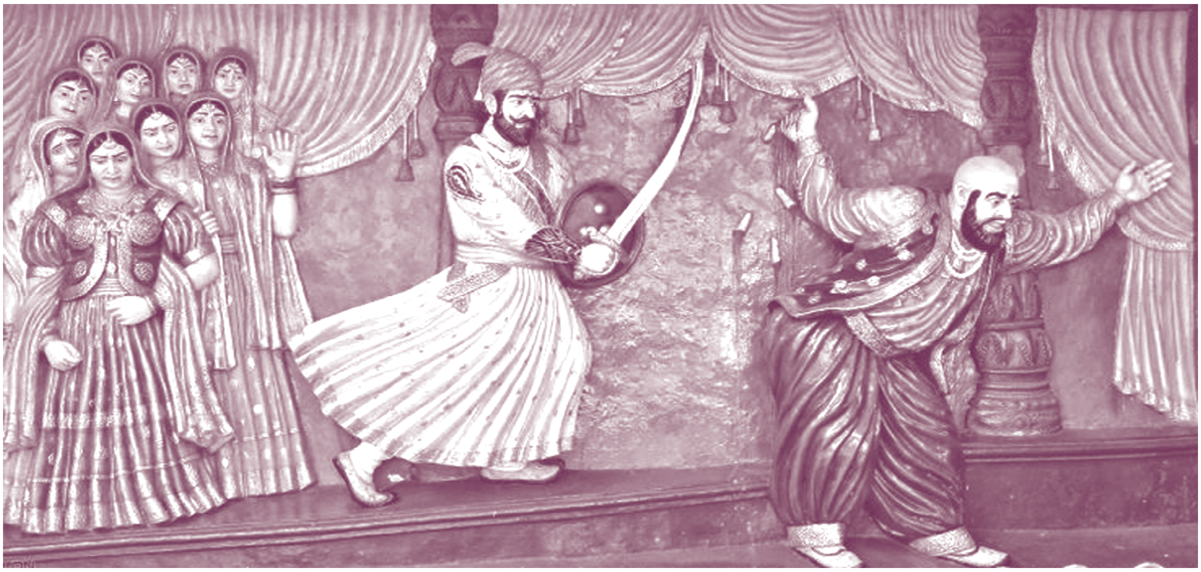

মহারাষ্ট্রে শিবাজীর প্রভাব ঔরঙ্গজেব কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। যে করেই হোক তাকে জব্দ করতেই হবে। ঔরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খাঁ এক শয়তান যোদ্ধা। ঔরঙ্গজেব তাকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালো শিবাজীকে শায়েস্তা করতে। সেইমতো শায়েস্তা খাঁ পুনায় এসে ঘাঁটি গাড়ল। এদিকে উটকো শায়েস্তা খাঁর আগমনে শিবাজী খুব বিরক্ত হলেন। নিজের দেশে বিদেশীর খবরদারি তিনি পছন্দ করেন না। এখান থেকে বিদায় করতে হবে তাকে। একদিন শিবাজী তাঁর বিশ্বস্ত সরদার ও মন্ত্রীদেরকে ডেকে পরিকল্পনায় বসলেন। শিবাজী বললেন— আমরা সবাই পুনাতে গিয়ে শায়েস্তা খাঁর মহলে ঢুকে ওকে হত্যা করে আসবো। শিবাজীর পরিকল্পনার কথা শুনে তো সবাই চমকে উঠলো। এক লক্ষ সেনা শায়েস্তা খাঁর মহল ঘিরে থাকে, সেখানে ঢোকা অত সহজ নয়। কিন্তু শিবাজীর প্রতি তাদের এতো বিশ্বাস যে কেউ না বলল না।

শিবাজীর পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু হলো। সেনারা নানা অছিলায় ছদ্মবেশে পুনাতে গিয়ে হাজির হতে লাগলো। রামনবমীর আগের রাতে আক্রমণ হবে। সেদিন পুনা নগরে বিয়ের বরযাত্রীর এক বিশাল শোভাযাত্রা বেরোলো। আসলে বরযাত্রীরা সবাই শিবাজীর সেনা। শিবাজীও তার মধ্যে আছে। মারাঠা সেনা এভাবে বরযাত্রীর বেশে পুনাতে ঢুকে গেল। মোগলরা তা বুঝতেও পারলো না। শায়েস্তা খাঁ যে মহলে থাকতো সেটির নাম লালমহল। শিবাজী গুপ্তচর মারফত মহলের সব নকশা তৈরি করে নিয়েছে। লালমহলের একটি মাত্র প্রবেশ পথ, সেখানে প্রহরী থাকে। সেখান দিয়ে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। আর একটি রাস্তা আছে রান্নাঘর দিয়ে। শিবাজী ও কয়েকজন যোদ্ধা সেই পথ দিয়ে লালমহলে ঢুকলো। বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মারাঠা সেনারা ছদ্মবেশে আছে ইঙ্গিত পেলেই যুদ্ধ শুরু হবে।

শায়েস্তা খাঁর অন্দরমহলে অনেক বেগমদের মাঝে তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শিবাজীরা রন্ধনশালা পেরিয়ে শায়েস্তা খাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। মারাঠা সেনা দেখে বেগমরা চিৎকার করতে লাগলো। চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল শায়েস্তা খাঁর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে হতভম্ভ হয়ে পড়লো।

ঘর অন্ধকার। কে শায়েস্তা খাঁ, কে বেগম কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শিবাজী তরবারি চালাতে লাগলেন। শিবাজী খুব সাহসী যোদ্ধা, তাঁর আক্রমণে কোনো উপায় না পেয়ে শায়েস্তা খাঁ পালাতে লাগলো। শিবাজীর তরবারির একটা কোপ এসে লাগলো শায়েস্তা খাঁর হাতে। তাতে আঙুল কাটা পড়লো। সেই কাটা হাত নিয়েই শায়েস্তা খাঁ পালিয়ে গেল। অন্ধকারে শিবাজী আর তাকে খুঁজে পেলেন না।

এদিকে মহলের ভিতরে গণ্ডগোল শুনে মোগল সেনা ছুটে আসতে লাগলো। কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ। তারপর দরজা যতক্ষণে খুললো ততক্ষণে শিবাজী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিজের দুর্গের দিকে রওনা দিয়েছে। এতবড় ঘটনা ঘটে গেল অথচ মোগল সেনা কিছুই করতে পারলো না। সবাই কেমন বোকা বনে গেল। এতোবড় অপমান! শায়েস্তা খাঁ লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে দিল্লী চলে গেল।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

অরুণাচল প্রদেশ

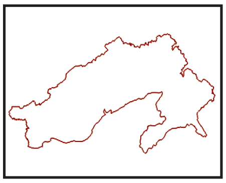

১৯৮৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এই রাজ্য গঠিত হয়। আয়তন ৮৩ হাজার ৭৪৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৬১১ জন। রাজধানী ইটানগর। এখানকার প্রত্যেক জনজাতির আলাদা আলাদা ভাষা। মোন্‌পা, মিজি, অকা, শের্দুকপেন, অপটনি, নিশিংগ্, তাগিন, তংগসা, বান্‌চে, খামতি ও মেম্বা। এই রাজ্য ৭৯ শতাংশ জনজাতির বাস। ব্রহ্মপুত্রনদ ও লোহিত নদী প্রধান। বনজ সম্পদ এ রাজ্যের আয়ের উৎস। ধান, ভুট্টা, জোয়ার, গম ও সরষে প্রধান কৃষিজাত ফসল। আটামিল, ধানমিল, প্লাইউড, হস্তচালিত তাঁত প্রধান শিল্প।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটাদুর্গ, তরাংয়ে প্রাচীন বৌদ্ধমঠ, দিশংয়ে বৌদ্ধবিহার পর্যটন কেন্দ্র। মালিনীথান, পরশুরামকুণ্ড, নমদফা অভয়ারণ্য দর্শনীয় স্থান। তোয়াংয়ে চীনযুদ্ধে শহিদ হওয়ার ৪০০০ ভারতীয় সৈনিকের স্মারক রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি

কুশল কিম্ ?
ভালো আছেন তো ?
অন্যঃ কঃ বিশেষঃ ?
আর বিশেষ কিছু ?
কুতঃ আগচ্ছতি ?
কোথা থেকে আসছেন ?
বিদ্যালযতঃ আগচ্ছামি।
স্কুল থেকে আসছি।
কুত্র গচ্ছতি ?
কোথায় যাচ্ছেন ?

ভালো কথা

রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা

গত রবিবার আমাদের পাড়ায় রক্তদান শিবির হয়ে গেল। প্রতি বছরই হয়। রক্তদান হয়েছে। চক্ষু পরীক্ষা হয়েছে, আর চশমা বিতরণ হয়েছে। সেখানে অনেকে রক্ত দিয়েছে। আমিও গিয়েছিলাম কিন্তু আমার নেয়নি। বলেছে পরে নেবে। আমি স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। অনেক বয়স্ক মানুষ চোখ দেখাতে এসেছিল। অনেকের হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তাদেরকে ধরে ধরে ডাক্তারের সামনে নিয়ে গেছি। যাদের চশমা দরকার তাদের চশমা দেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় এখানে বস্ত্র বিতরণও হয়। গরিব দুঃখীদের জামাকাপড় দেওয়া হয়।

পীযূষ কর্মকার, সিথিঁরমোড়, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমার সকাল

মৌমিতা দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, আলিপুরদুয়ার

পুব আকাশে ভোরের বেলা
গেরুয়া রঙের আলোর রেখা
পাখি ডাকে কিচিরমিচির
হরিনাম করে ভক্ত ঠাকুর।
বারান্দাতে মাদুর পেতে
পড়তে বসি ভাইয়ের সাথে

দুধওয়ালা এসেই দোরে
বেলটি বাজায় কিরিং করে।
গরম দুধে মুড়ি কলা
খেতে দারুণ মায়ের দেওয়া
পড়া শেষ হলে পরে
খেলতে ছুটি পুকুর পাড়ে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

নারীবাদ না মাতৃত্ববাদ ?

অনুপূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তো সেদিন ৪৫নং বাস থেকে নামার সময় মাঝবয়সি ছেলেটি বললেন, ‘আপনারা মায়েরা একটু সাবধানে নামবেন...’ পাশ থেকে আমারই সমবয়সি এক বান্ধবী তাই শুনে বাস থেকে রাস্তায় নেমে গর্জিয়ে উঠে বলল, ‘খালি মা, মা! মা ছাড়া কি আর অন্য কোনোভাবে মেয়েদের সম্বোধন করা যায় না?’ ভাবতে লাগলাম, এ হেন মা ডাক শোনার জন্য আমাদেরই পূর্বসূরিরা কী তপস্যাই না করেছিলেন। আর আজ সেই স্বতঃস্ফূর্ত মা ডাকই নারী জাতির লজ্জার কারণ!

মা ডাকের প্রতি এই বিরূপতা কি পেরেছে সমাজকে মানসিক সুস্থতা দিতে? আজকের ভারত কি নারীর সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম? আমাদের দেশে নারীত্বের মাপকাঠিই বা কী? আধুনিক ভারতীয় সমাজে নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, উৎপীড়ন, আক্রমণ ইত্যাদি বিকৃতির বিস্তার কি প্রমাণ করে না যে অধিকার সচেতন নারী সমাজ সংস্কারকেরা মাতৃত্বকে ভারতীয় কৃষ্টির আলোকে দেখতে ভুলে গেছেন? তাঁরা কি স্বীকার করবেন যে এই মস্তিষ্ক ধোলাইকারী বিষকুম্ভ বহুকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নতা-আচ্ছন্ন পশ্চিমি দুনিয়া থেকে বেমালুম ধার করা হচ্ছে?

অঙ্গনা

নারী-পুরুষের সমতা

যদি সত্যিকার সাম্যবাদের কথাই বলতে হয়, তাহলে এটিও বলা দরকার যে পুরুষ যদি সমাজের অধঃপতনের জন্য দায়ী হয়, তাহলে দায়িত্বের অর্ধাংশ নারীরও বহন করা কর্তব্য। সত্যকার সমতা বোধের মাপকাঠিতে অধিকার সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যপরায়ণতাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। স্মরণ করা যাক ভারতবর্ষের নারীর কর্তব্যপরায়ণতার কিছু দৃষ্টান্ত : ‘ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের তাঁর স্বামীর রাজত্বের জন্য বলিদান। রানি রাসমণির তাঁর প্রজাবর্গের প্রতি নিঃস্বার্থ মমতা। অহল্যাবাইয়ের আমরণ সমাজসেবা ও সমাজোন্নতি, ভগিনী নিবেদিতার এ দেশের প্রতি তুলনাহীন অবদান বা দেশ মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়তা, আন্তরিক একাত্মতা কি প্রমাণ করে না যে তাঁদের অধিকার সচেতনতাকে ছাপিয়ে গেছে তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মনিষ্ঠা? তাই তো সেই দায়িত্ববোধের গভীরতা থেকে জন্ম নিয়েছে অন্তরের অপরিমেয় শক্তি।

শক্তিকরণের উৎস সন্ধানে

শক্তিকরণের উৎস সন্ধানে বিশ্বব্যাপী আজ ‘স্বকীয় সত্তা’ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। দেখা যাক নারীর মুখ্য সত্তা বিচারের মাপকাঠি কী? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, The ideal of woman in India is the mother... In an Indian home the mother rules.

নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি বারবার এই মাতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। তাই তো আজ বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন, ধনবতী, জড়বাদী ভারতীয় নারীর চলন-বলন, আদব-কায়দা, বেশ-বাস, কথোপকথন ভঙ্গি শালীনতার বাঁধন অবলীলায় ছাপিয়ে যায় অন্ধকার স্বাধীনতার সন্ধানে।

শিক্ষা ও প্রতিযোগিতা

আমরা জানি পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধই যে কোনো মানুষের শিক্ষার প্রথম ধাপ। পরিবাররূপী পাঠশালার মধ্যমণি পরিবারের কর্ত্রী তথা মা! তাঁর অন্তরের অন্তরতর মূল্যবোধের উপরেই স্থাপিত হয় পরিবারের অন্য ব্যক্তিদের জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ চরিত্র। অন্তরের শিক্ষাই বাইরের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে। আবার অন্তরের প্রতিযোগিতাই বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাম্প্রতিককালের নারীদের অধিকার সচেতনতা তাদের পুরুষের পরিপূরক নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী করেছে। আবার এই নারীই তো শিশুর প্রথম শিক্ষিকা...। অন্তরের অপূর্ণতায় তাই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ, হিংস্র বহিরঙ্গ তৈরি করেছি। চরিদিকের অসহিষ্ণুতা বস্তুবাদী, অন্তহীন লালসারই পুঞ্জীভূত রূপ নয়? এই স্বাধীনতাই কি নারীর সত্যকার স্বপ্নের স্বাধীনতা? রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘গৃহিণী সংসারে সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন। কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না, আনন্দ সাধন রূপেই জানেন।’ এর জন্য তাঁকে মাসিক বেতন দিলে কি তাঁর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পাবে!

আনন্দ ও পরধর্ম সাধন

গৃহিণীর আনন্দের উৎস সংসার, তেমনি নারীর আনন্দের উৎস মাতৃত্বে। মাতৃত্ব তাঁর স্বধর্ম। স্বধর্মকে ত্যাগ করে পরধর্ম (অর্থের বিনিময়ে চাকরির দাসত্ব) আচরণ নারীশক্তির বা নারীর মর্যাদার উৎস হতে পারে না। ভারতের মাপকাঠিতে বিদেশি চেতনায় সিঞ্চিত, অধুনা ভারতীয় নারীর মাতৃত্বে অনীহা নারীত্ব বর্জনেরই নামান্তর, নারীর ভোগবিলাসী মনোভাবের উৎস। মনে রাখা প্রয়োজন— ‘স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ/পরধর্ম ভয়াবহঃ’ (শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতা)। পুরুষের পক্ষে চাকরি যখন বাধ্যতামূলক কর্ম হয়ে পড়ে, নারীরও কি সেই একই আদর্শ বা ধর্ম হওয়া উচিত? ত্রিকালদর্শী ঋষিপ্রতিম বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মতো মনীষীদের গঠনমূলক দিকদর্শনকে আমরা কিছু সংখ্যক ডিগ্রিধারী, কেরিয়ার ধর্মী, নির্বুদ্ধিজীবীদের অন্তঃসারশূন্য বাক্যস্রোতের বানে ভাসিয়ে দিতে পারি না। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সব দেশেরই সমাজসৌধের ঝকঝকে বহিরঙ্গের পেছনে পূতিগন্ধময় আস্তাকুঁড় অবশ্যই আছে। ভারতবর্ষকে একথা স্মরণ রেখে অগ্রসর হতে হবে। নচেৎ ‘মহতী বিনষ্টি’।

(সৌজন্যে ‘বর্তমান’)

অতিথি কলম

কাশ্মীরের দীর্ঘকালীন ছায়াযুদ্ধ

অপকৌশলী পাকিস্তান আমাদের দেশকে ভাঙতে চাইছে

বেঙ্কাইয়া নাইডু

সন্ত্রাসবাদী হিজবুল মুজাহিদিন নেতা বুরহান ওয়ানি আমাদের বীর নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হওয়ার পর অত্যন্ত উদ্ভট ও আপত্তিজনক যুক্তিতে রাজনৈতিক মহলকে উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টা চলছে। এই কাজে মিডিয়ার একটা অংশ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বাহিনী নিহত সন্ত্রাসবাদীর প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন ছাড়াও সরকারকে এই মৃত্যুর জন্য কাঠগড়ায় তুলতে অত্যন্ত তৎপর।

মনে রাখতে হবে, কাশ্মীরে আজ যা ঘটছে বা যার দায় এনডিএ সরকারের ওপর চাপানো হচ্ছে তা কিন্তু রাতারাতি ঘটেনি। অনেকেই জানেন কাশ্মীরের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। যার উল্লেখ আমার সতীর্থ এম জে আকবর লোকসভায় উত্থাপন করেছিলেন। আকবর বলেছিলেন, দেশভাগজনিত ক্ষত থেকে তখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি সেই আপৎকালীন সময়েই দ্বিজাতিতত্ত্বকে হাতিয়ার করে ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীর হাতিয়ে নিতে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বসেছিল।

> **দ্বিচারিতার মাধ্যমে কংগ্রেস সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি চায় আর সেই বাসনায় দেশের অখণ্ডতাও তার কাছে তেমন মহার্ঘ নয়। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের একতা ও সংহতির ক্ষেত্রে খেলা করা যায় না। করা যায় না রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কোনো মতলব। পাকিস্তানের এই খুল্লামখুল্লা ছায়াযুদ্ধ প্রতিহত করতে সারা ভারতকে এককাট্টা হতেই হবে।**

১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের দু' দুটি নিষ্ফল সামরিক অভিযানের পর পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে এই রাস্তায় তারা ভারতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এর ফলে ৮০-র দশকের শুরু থেকেই পরিভাষায় যাকে 'শরীরের হাজার জায়গায় চোট পৌঁছনো' (a thousands cut) বলা হয় সেই অভিসন্ধি নিয়েই চলেছে। এর ফলে এটা পরিষ্কার যে কাশ্মীর নিয়ে যে সমস্যা যুগব্যাপী প্রলম্বিত তা পাকিস্তানের এই ছায়াযুদ্ধেরই পরিণতি। কিন্তু কাশ্মীর বিষয়টির একটা আদর্শগত মাত্রা আছে সেটা এড়িয়ে গেলে কিন্তু আমরা নিজেদেরই সর্বনাশ করব।

সারা বিশ্ব আজ জানে যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের সবরকম প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া ছাড়াও দরকারে তাদের ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়ে হিংসা ছড়ানোর ক্ষেত্রেও সব রকম মদত দিয়ে থাকে। এর ফলে কাশ্মীরের তরুণরা একদিকে সরাসরি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর, আবার তাদের প্রেরিত সন্ত্রাসবাদীদের প্ররোচনাতেও জড়িয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এনডিএ সরকার কাশ্মীরে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অত্যন্ত সংবেদনশীল এই সীমান্তরাজ্যের পরিস্থিতি সরকার কড়া কিন্তু মানবিক মুখ বজায় রেখেই মোকাবিলা করতে চায়। এই প্রচেষ্টায় কাশ্মীরবাসীর মন জয় করা সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় সর্বোচ্চ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রচেষ্টায় কিছু সময় লাগলেও অতি পরিচিত সেই কাশ্মীরিয়তই শেষাবধি বিজয়ী হবে। আর তা হলেই পাকিস্তানের মুখোশ খসে পড়বে।

সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ রাখতে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করেছে যারা উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাগজ বা পাঁউরুটির তৈরি গোলা ব্যবহার করা যায় কিনা তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। খুব শীগগিরই এই বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত দেবেন। একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য ও হাস্যাস্পদভাবে রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে যে কোনো ভারতবাসীরই নজরে পড়বে যে নিজের আদর্শকে আস্তিনের তলায় রেখে কিছু প্রতিবেদন লেখক নির্লজ্জের মতো বুদ্ধিজীবীর চশমা পরে লিখছেন—'আজাদি' নামক স্লোগানটি নিয়ে কেন্দ্রের যথোপযুক্ত চর্চা করা উচিত।

ফঃ ৪

এটা বোঝার সময় এসেছে যে আরাম কেদারায় বসা এই সমস্ত কলমচির উপদেশ মতো একজন আম নাগরিককে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে সব রকম আইনি প্রটোকল মেনে আটক করা আর কট্টর কোনো জঙ্গির রাইফেলের সঙ্গে জান লড়িয়ে তাকে ধরা এক জিনিস নয়। এঁরা কি বলতে পারেন হাতে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রধারী একজন কট্টর জঙ্গির মোকাবিলায় কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

কিন্তু এটা ভাবতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, যাঁরা আজ সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে রোমান্টিক ভাবনায় মশগুল হয়ে তাদের জন্য গোপনে অশ্রুজল ফেলছেন, তাঁরা কি সত্যিই জানেন না কোন মরণপণ পরিস্থিতিতে সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপি-র সৈনিক, কাশ্মীরের পুলিশবাহিনীকে অবিরাম লড়ে যেতে হচ্ছে। তাঁরা কি জানেন না জিহাদের পাঠ পড়ানো অজস্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী ভারতের সংহতির একেবারে অন্তঃস্থলে আঘাত করার জন্য যে কোনো ধরনের হিংস্র নরহত্যায় পিছপা নয়? নিয়ত সীমান্তপার থেকে অনুপ্রবেশের ফলে দেশের অভ্যন্তরের ধ্বংসাত্মক শক্তি নিজেদের আরও শক্তিধর মনে করে নিরাপত্তারক্ষা বাহিনীর ওপর দ্বিগুণ হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কি এমনটা অনুমোদন করবে যে সন্ত্রাসবাদীদের নরমভাবে মোকাবিলা করো? বিশেষ করে দেশের একতা ও সংহতি যখন বিপন্নতার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তখন এই বিষয়টা নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্কের সূচনা কি দেশের শোভা পায়?

মুম্বই হামলার মূল পাণ্ডা সন্ত্রাসী হাফিজ সইদ জানিয়েছে যে নিহত বুরহান ওয়ানির নাকি শেষ ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে কথা বলার। এই ব্যক্তির কথার সবটাই সত্য এমনটা ধরে না নিয়েও বলা যায় যে এই সূত্রে যারা নিরাপত্তাবাহিনীর কাজ নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে তাদের বোঝা উচিত পাকিস্তান এই ইস্যুটা নিয়ে কী জঘন্য উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা করছে। আজ যখন সারা পৃথিবী নিত্যদিন সন্ত্রাসবাদের অভূতপূর্ব বীভৎসতায় কম্পমান ও তার সঙ্গে যুঝতে প্রাণপাত করছে সেখানে কি কারোর সন্ত্রাসীদের জন্য সমবেদনা জানানো শোভা পায়?

নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে ভুল-ত্রুটি ঘটলে দেশের গৃহীত আইন কানুন অনুযায়ী তা শুধরে নেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যারা দেশকে ভাঙতে চায় এমন সন্ত্রাসবাদীর হয়ে ওকালতি করা কখনই মেনে নেওয়া যায় না।

তাজ্জব হওয়ার ব্যাপার, যে সমস্ত আরামকেদারার কলমচি ও তাদের দোসর তথাকথিত সুশীল সমাজের লোকজন যারা সরকারের সকল কাজকর্মের তীব্র সমালোচনায় মুখর থাকেন তাঁরা কিন্তু একজন দায়িত্ববান সিআরপিএফ কনস্টেবল বা সৈনিক বা নিরাপত্তারক্ষী-বাহিনীর সদস্য যখন দেশের সংহতি রক্ষায় নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদীর বুলেটের মুখে লুটিয়ে পড়েন তখন তারা এক তুরীয় নীরবতা পালন করে থাকেন। তাঁরা বাকরুদ্ধ অবস্থায় বিরাজমান হন। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য কি মানবাধিকার প্রযোজ্য নয়?

অবশ্যই আমাদের মর্মবেদনা থাকবে সেই সমস্ত নিরীহ, অসহায় মানুষদের প্রতি যাঁরা বিনা দোষে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হয়ে পড়ছেন। ভাবলে হতবাক হতে হয় যখন চিরশত্রু পাকিস্তান তার আয়ত্তে থাকা যা কিছু কদর্য কৌশল প্রয়োগ করে কাশ্মীরে এক অরাজক পরিস্থিতি কায়েম করতে চাইছে যাতে স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই না ফিরে আসতে পারে। কংগ্রেস নেতা চিদাম্বরম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলে বসলেন কাশ্মীরের ভারত সংযুক্তির সময় যে সমস্ত শর্ত উল্লেখিত হয়েছিল আজ সরকারের উচিত কাশ্মীরবাসীকে সব শর্ত সম্পর্কে যথাযোগ্যভাবে আবার অবহিত করে তাদের আস্থা ফেরানো। অথচ শেষ দশ বছর ইউপিএ-২ ক্ষমতায় অধিষ্ঠান করেছিল আর শ্রী চিদাম্বরম ছিলেন তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তখন কেন তিনি সেই সব প্রতিশ্রুত শর্তগুলি পূরণ করেননি? কেন তাঁর মনোমতো Grand Bargain-এর মাধ্যমে বরাবরের জন্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করেননি? বোঝাই যায় এই দ্বিচারিতার মাধ্যমে কংগ্রেস সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি চায় আর সেই বাসনায় দেশের অখণ্ডতাও তার কাছে তেমন মহার্ঘ নয়। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের একতা ও সংহতির ক্ষেত্রে খেলা করা যায় না। করা যায় না রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কোনো মতলব। পাকিস্তানের এই খুল্লামখুল্লা ছায়াযুদ্ধ প্রতিহত করতে সারা ভারতকে এককাট্টা হতেই হবে। ▮

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

রসাল নন্দনের আলোক-রেখায় কান্ত-কবির গান

শুভঙ্কর দাস

Rajanikanta Sen
The Poet of Divine Sensiblities
July 26, 1865
September 13, 1910

‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।’

কেবলমাত্র এই স্মৃতিধার্য উচ্চারণেই বাংলা গানের জগতে রজনীকান্ত সেন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রজনীকান্তের আবির্ভাবলগ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই গীতি কবিতার আধুনিকতার প্রেক্ষাপটের প্রসঙ্গ চলে আসে। গীতিকবিতা কবি হৃদয়ের রস-সাগরের মন্থন-সঞ্জাত রত্নাবলীর মণিমঞ্জুষা। বঙ্গ-কবিতারাজ্যে গীতিকবিতার মন্দাকিনী ধারায় প্রথম নবযুগের আভাস সূচিত করেন কবি বিহারীলাল। কিন্তু সেই আভাসের যে সম্পুর্ণায়ন ঈপ্সিত ছিল, তা সার্থকতা লাভ করেছে বিহারীলালের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঘনীভূতব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক কাব্যসঙ্গীত রচনার পথিকৃৎ সে বিষয়ে বাংলার বিদগ্ধ সমাজ একমত। সঙ্গীতে যত রকমের সুরস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তার সুরধ্বনিকে রবীন্দ্রনাথ এক সমন্বয়মূলক একীকরণ-সূত্রে গ্রথিত করে তাঁর কাব্যসঙ্গীতে প্রয়োগ করেছেন। কাব্যসঙ্গীতের এই সুনৈপুণ্যকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শ্রোতাদের হৃদয়মন্দিরে স্বর্ণবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সুরস্রষ্টা, রসসন্ধানী সারস্বতবৃত্তির উপাসক। তাই কবিতাকে সঙ্গীতের প্রসাদগুণে রূপান্তরিত করে তাঁর কাব্যসঙ্গীত হয়েছিল চিরন্তন। তাই ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’ও রবীন্দ্রনাথের গানের সুরধ্বনি লোকসাধারণের চিত্তলোকের দিগন্তে ঝংকৃত হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রযুগে বাংলা গানের আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা অবশ্যই বলতে হবে। বাকবিলাসী ছন্দ নিপুণতা ও সৃজনশীলতায় তিনি হাস্যরসাত্মক গান সৃষ্টি করে ‘হাসির রাজা’ নামে পরিচিত লাভ করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধারার সংমিশ্রণে বাংলা গানে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন, যা দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে লোকপ্রিয় হয়।

এই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভায় আলোকিত বাংলা গানের জগতে আবির্ভূত হয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যে-কোনো নবাগত গীতিকারের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব, তখনই রজনীকান্ত সেন তাঁর সঙ্গীত-সাধনার অপরূপ সুরসৃষ্টি নিয়ে বাংলা গানের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে কান্ত কবি হিসেবে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। রজনীকান্ত ছিলেন গীতিপ্রাণ কবি। তিনি তিনশতের মতন গান রচনা করলেও কবি-যশ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। এই বছরটা তাঁর সার্ধশত বার্ষিক উদ্‌যাপনের সময়। কান্তকবি হিসেবে খ্যাত রজনীকান্ত একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অননুশীলিত। সঙ্গীত পরিবেশনের চলিষ্ণুতা অবধি একজন শিল্পীর সৃজনী পথরেখার অস্তিত্ব শ্রোতার স্মৃতিপটে থাকে। তারপর যুগধর্ম অনুসারে প্রজন্মের রুচির ব্যবধানে তা শ্রোতার স্মৃতির মণিকোঠা থেকে ধীরে ধীরে বিস্মরণ হতে থাকে। তাই রজনীকান্তের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলির মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে একজন কবি-শিল্পীর প্রতিভার পরিচয়দানের পাশাপাাশি শ্রোতা ও সাহিত্যপিপাসু পাঠকদের প্রজ্ঞাপ্রসু মননের বিকাশ ঘটানোর নিরিখে ইহলোকত্যাগী কবির সৃষ্ট কর্মকে অনুধাবন করানো। স্পষ্টতই রজনীকান্তের জীবনপঞ্জি ও কাব্য-কলানৈপুণ্যের কথা অবতারণায় অন্বিষ্ট হচ্ছে তাঁর সৃজনী প্রতিভা ও শাশ্বত বোধের কথা বর্ণনের মাধ্যমে স্মৃতি-সুরভিত করা।

২৬ জুলাই, ১৮৬৫ খৃস্টাব্দ। বুধবার। লোকসংস্কৃতিতে ঐতিহ্যমণ্ডিত পাবনা (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে বৈদ্যবংশে রজনীকান্তের জন্ম। রজনীকান্তের পরবর্তীতে সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), কবি প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), কবি ও উপন্যাসিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কবি ও শিশুসাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬- ১৯৭৯), মার্গসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী পণ্ডিত শ্যামল লাহিড়ী (১৯১৬-১৯৮৪), কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার

(১৯১৮-২০০১), অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্মক্ষেত্র হওয়ায় পাবনা জেলা ঐতিহ্যিহপুষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে গৌরবের দিক থেকে পাবনা জেলার ভূমিপুত্র রজনীকান্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জীবনপঞ্জী থেকে যতদূর জানা যায় রজনীকান্তের প্রপিতামহ যোগীরাম সেন এবং পিতামহ গোলকনাথ সেন ছিলেন বঙ্গজ বৈদ্য পরিবারের সন্তান। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন পেশায় ছিলেন মুন্সেফ। তিনি ছিলেন ইংরেজি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। কর্মোপলক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি মুন্সেফ থেকে ক্রমে সাবজজ পদে উন্নীত হন। কালনা ও কাটোয়ায় চাকরি করাকালীন তিনি বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতি জন্মে তাঁর গভীর অনুরাগ। এমনকী বৈষ্ণবধর্মের প্রতি ঔৎসুক্যবশত তিনি ব্রজবুলি ভাষায় ‘পদচিন্তামণি’ নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ধর্মপ্রাণ গুরুপ্রসাদ ধর্মীয়তত্ত্ব ও দেহতত্ত্বমূলক গান গাইতে পছন্দ করতেন।

রজনীকান্ত গুরুপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র। রজনীকান্তের মাতামহ হরিমোহন সেন সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগ্‌বাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রজনীকান্তের মাতা মনোমোহিনীদেবী রন্ধন নিপুণা, ধর্মপরায়ণা ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। পিতা-মাতার গভীর সঙ্গীত ও সাহিত্য-প্রীতি শৈশবেই রজনীকান্তের মনের অন্তঃপুরে সুর ও কাব্য সৃষ্টির একটি অনুকূল মানসিকতা গঠন হয়ে যায়। কুঞ্জবিহারী দে-র ‘আশালতা’ পত্রিকাতে আশা কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য-জীবনের সূত্রপাত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বোয়ালিয়া জেলা স্কুল(বর্তমানে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। এ সময়ে সরকারিবৃত্তি ১০ টাকা এবং রাজশাহী বিভাগের সমস্ত স্কুলের মধ্যে ইংরেজি প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পাঁচ টাকা ‘প্রমথনাথ বৃত্তি’ পান। এরপর রাজশাহী কলেজে এফ.এ-তে ভর্তি হন। এফ.এ পাঠরত অবস্থায় ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন রাধেশচন্দ্র শেঠ, বিপিনবিহারী ঘোষ, চন্দ্রময় সান্যাল। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ পাশ করে বি.এ পড়ার জন্য সিটি কলেজে ভর্তি হন। বি.এ পড়াকালীন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৮৬)। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে সিটি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন এবং সেখান থেকেই ১৮৯১ খৃস্টাব্দে বি.এল পরীক্ষায় পাশ করেন।

বি.এল ডিগ্রি লাভের পর তিনি রাজশাহীতে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা ও ওকালতি যুগপৎ চলতে থাকে। রাজশাহীতে থাকাকালীন দু’জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। একজন হলেন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং অপরজন হলেন কবি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-রসাত্মক গানের সুর শুনে আপ্লুত হয়ে রজনীকান্ত ‘তোমরা ও আমরা’ কবিতা রচনা করেন এবং তা ‘উৎসাহ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র উদ্যোগে রজনীকান্তের প্রথম কাব্য গ্রন্থবাণী (১৯০২) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। এরপর তিনি সাতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কল্যাণী (কাব্য) ১৯০৫ এবং অমৃত (নীতি কবিতা) ১৯১০, দুটি তাঁর জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত) ১৯১০, বিশ্রাম (কাব্য) ১৯১০, অভয়া (কাব্য) ১৯১০, সদ্ভাবকুসুম (নীতি কবিতা) ১৯১৩ ও শেষ দান (কাব্য) গ্রন্থগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। মাতা মনোমোহিনীদেবী, ভার্যা হিরণ্ময়ীদেবী, পাঁচ পুত্র— শচীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ এবং চার কন্যা— শতদলবাসিনী, শান্তিবালা, প্রীতিবালা ও তৃপ্তিবালা-দের নিয়ে রজনীকান্তের পারিবারিক জীবন। রজনীকান্তের জীবদ্দশায় তাঁর তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ‘ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস’ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং পরে তাঁর কন্যা শতদলবাসিনী পরলোকগমন করেন। পুত্র-কন্যা বিয়োগজনিত বেদনা তিনি মুখ বুজে সহ্য করেন এবং নিজের এই দুঃখ-বেদনাকে করুণাময় ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে তিনি সান্ত্বনা লাভ করেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রজনীকান্ত মূত্রকৃচ্ছ রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এর সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগেও আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। কলকাতার চিকিৎসকরা তাকে বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেন। সেমতো তিনি কটকে যান। সেখানকার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফিরে এসেও রোগ তাঁর পিছন ছাড়ল না। তিনি পুনরায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন তিনি কলকাতায় প্রথমে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করেন। কিন্তু সুফল পেলেন না। এরপর তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালেন। কিন্তু তাতেও সুফল না পেয়ে তিনি কবিরাজ শ্যামদাস সেনের নিকট চিকিৎসা শুরু করলেন। অবশেষে কবিরাজি চিকিৎসায় ফল পেলেন এবং বহুলাংশে সুস্থ হন। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাঁর সুঠাম-দেহ শীর্ণদেহে পরিণত হয়। তিনি রাজশাহীতে ফিরে যান। এর কয়েক মাস পরে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর জন্মভূমি ভাঙ্গাবাড়িতে যান এবং সেখানে থাকাকালীন পুনরায় ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সিরাজগঞ্জে তাঁর বাল্যবন্ধু ডাক্তার তারকেশ্বরের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সমাগম ঘটে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রজনীকান্ত স্বরচিত দুটি গানে সুরারোপ করে সুললিত দরাজ

কণ্ঠে তা পরিবেশন করে আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেন। এর ঠিক দু'মাস পরেই রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয়- সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন। এখানেও রজনীকান্ত তাঁর স্বরচিত গান পরিবেশন করে অভ্যাগত অতিথিদের মোহিত করে দেন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ থেকে রজনীকান্ত পুনরায় রোগাক্রান্ত হন। প্রথমে গলা ফোলা তৎসহ অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। স্থানীয় ডাক্তাররা বলেন তাঁর ফ্যারিনজাইটিস রোগ হয়েছে। সে মতো চিকিৎসা চলল। ওষুধ খেলেন কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হলো না। এমতাবস্থায় নিজস্ব কিছু কাজের জন্য রজনীকান্ত রংপুরে যান। সেখানে তিন দিন থাকাকালীন ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত গান গাওয়ার ফলে গলার ব্যথা বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজশাহীতে প্রত্যাবর্তন করে আইন-ব্যবসায় যোগ দেন। এদিকে গলার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনকী তাঁর শ্বাসকষ্টের সঙ্গে খাওয়াও প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হলো। অগত্যা তিনি সপরিবারে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন। মৃন্ময়ী জননীস্বরূপ রাজশাহীর স্নেহে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল তাঁর কবি হৃদয়। এবার সেই বন্ধন ছিন্ন করে রাজশাহীকে তিনি চিরকালের জন্য ত্যাগ করলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে ডাক্তার ওকেনলি সাহেবের কাছে চিকিৎসার জন্য যান। ওকেনলি সাহেব পরীক্ষা করে জানান, তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কলকাতায় রজনীকান্ত কয়েকদিন থাকলেন। চিকিৎসা চললো। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় মনস্থির করলেন কাশীতে চিকিৎসার জন্য যাবেন। কাশী যাবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় রজনীকান্ত তাঁর 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গ্রন্থ দুটির স্বত্ব গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এর কাছে চারশো টাকায় বিক্রি করলেন। কাশীতে এসে বালাজী মহারাজের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগলো। কিন্তু এই মারাত্মক রোগের কবল থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না। গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, জ্বর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার ফলে কাশী ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় পুনর্গমন করতে বাধ্যহলেন। কলকাতা এসে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগতে লাগলেন। শ্বাসকষ্ট লাঘব করার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ক্যাপটেন ডেনহ্যাম হোয়াইট রজনীকান্তের কণ্ঠদেশে 'ট্র্যাকিওটমি' অস্ত্রোপচার করেন। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর কণ্ঠ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হলো। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হেমেন্দ্রনাথ বক্সীর সহায়তায় রজনীকান্তকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে মেডিক্যাল কলেজের ১২নং কটেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কটেজে থাকাকালীন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার, সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি রজনীকান্তকে দেখতে আসতেন। দুরারোগ্য রোগে তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হলেও কাব্যরচনা থেমে থাকেনি। যন্ত্রণাদগ্ধ কান্তকবি কটেজে রোগশয্যা থেকেই 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'অভয়া' কাব্যত্রয় রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশীর্বাদ-ধন্য রজনীকান্তকে শেষবারের মতন দেখতে এলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রবীন্দ্রনাথ দর্শনে রজনীকান্তের হৃদয় আনন্দে হলো পরিপ্লাবিত। ক্যান্সার রোগে বাক্‌রুদ্ধ, জ্বর প্রায় একশো চার ডিগ্রি, এরকম শারীরিক অবস্থায় রজনীকান্ত রোগশয্যা ছেড়ে উঠে এসে মাথা অবনত করে রবীন্দ্রনাথের চরণতলে অর্ঘ্য দান করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণাধিক কবিকে স্নেহালিঙ্গন করলেন। এই আলিঙ্গনে রজনীকান্তের হৃদয় স্নেহরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেখে যাবার পরেই রবীন্দ্র-আশীর্বাদে পুষ্ট রজনীকান্ত একটি গান রচনা করেন এবং তা রবীন্দ্রনাথকে পরের দিন পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে লিখলেন— ''....ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।'' রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত এই চিঠি ছিল রজনীকান্তের গানের বাণীর শেষ মূল্যায়ন। এক ভাদ্র-রাত্রিতে মেডিক্যাল কলেজের কটেজের শয্যা চিরদিনের মতন ত্যাগ করে রজনীকান্ত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। দিনটি ছিল ১৯১০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

(লেখক সেন্টার ফর ফককালচার স্টাডি এবং লোকসংস্কৃতি সংবাদের সম্পাদক, মালদা জেলা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বাংলাদেশের আয়নায়

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেখ হাসিনা কতটা আন্তরিক?

হসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতই বলুন বাংলাদেশে আলকায়দা বা আই এস-এর কোনো অস্তিত্ব নেই, ঘটনা হলো, আই এস-এর প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু বকর আল বাগদাদির প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশের নবীন প্রজন্ম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ২০১৪ সালে যখন মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তখনই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আই এস তাদের নেটওয়ার্কে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে। বাগদাদির সমর্থনে স্থানীয় মানুষ এগিয়ে আসায় আই এস-এর আরও সুবিধা হয়ে গেছে। সম্প্রতি বাগদাদি একটি অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়েছে বাংলাদেশে আই এস-এর কাজকর্ম এখন থেকে দেখাশোনা করবে শেখ আবু ইব্রাহিম। কাজকর্ম বলতে সমগ্র বাংলাদেশে শরিয়ত আইনের প্রতিষ্ঠা। যদিও বাংলাদেশে এখনও খিলাফতের পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। আই এস-এর প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের বাংলাদেশে আসার প্রমাণও পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না বাংলাদেশে আই-এস-এর অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেটা বোঝেন কিন্তু মানেন না। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলা, সংখ্যালঘু নিধন এবং মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের দায় তিনি চাপাতে চান জামাতে ইসলামি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ওপর। তাঁর অভিযোগ জাতীয়তাবাদী দল ও তার সঙ্গী জামাত বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চাইছে। যেহেতু তারা নির্বাচনে আওয়ামি লীগের কাছে গো-হারান হেরেছে তাই তাদের এহেন দুর্মতি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা সন্ত্রাসবাদ এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জামাত নেতাদের ফাঁসি হয়ে যাবার পর বিরোধী দলগুলি বলতে শুরু করে সরকার বেছে বেছে রাজনৈতিক শত্রুদের ফাঁসি দিচ্ছে। এর পাশাপাশি, ধর্মীয় মৌলবাদে ইন্ধন দেবার অভিযোগও আনা হয় সরকারের বিরুদ্ধে। তার কারণ শেখ হাসিনার একটি মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বা লিখলে তাকে রেয়াত করা হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সময়ে মন্তব্যটি করা হয়েছে তার কিছুদিন আগেই ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট ১০ জন ইসলামবিরোধী মানুষের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে এবং তাদের একে একে হত্যার হুমকিও দিয়ে ফেলেছে। তালিকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ ওয়াসিউদ্দিন-সহ আরও অনেক গণ্যমান্য মানুষ রয়েছেন। সুতরাং বিরোধীরা ভুল কিছু বলছেন না।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশের অভিমত হাসিনা সরকার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানোর ফলে এখনও পর্যন্ত রাঘববোয়ালেরা কেউ ধরা পড়েনি। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করছেন সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার আড়ালে এই সরকার আসলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকেশ করতে চাইছে। যে কারণে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলার দায়ে অভিযুক্ত জামাতে ইসলামির পাঁচজন প্রথম সারির নেতার ফাঁসি হয়ে যাবার পরেও সন্ত্রাসের রাশ টানা যাচ্ছে না। উপরন্তু আই এস-এর সঙ্গে যোগসাজশ থাকার কারণে কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরেও গ্রেপ্তার হয়েছে কয়েকজন বাংলাদেশি। অভিযোগ, তারা হামলার পরিকল্পনা করছিল। কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত জানতে চাওয়া হলে তারা নিজেরাই আই এস-এর নাম করে। বস্তুত বাংলাদেশের অনেক মানুষ বাগদাদির অধীনে সিরিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়। বাগদাদি স্বয়ং আরবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে। অনেকেই মনে করছেন বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে এই দেশ যদি একদিন পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের মতো সন্ত্রাসদীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখার কথা বলেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো চলে না। কিন্তু হাসিনার কার্যবিধি যেসব জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় তা এড়িয়ে চলাও মুশকিল। প্রথমত, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাসিনা এবং তাঁর সরকার কতটা আন্তরিক? প্রশ্নটা উঠছে কারণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র সেনাবাহিনী পুলিশ বা প্রশাসনের কাজ নয়। স্থানীয় মানুষ আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিলে কোনো সন্ত্রাসবাদ এমন সর্বময় হয়ে উঠতে পারে না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার একটা বড় অংশ সারা পৃথিবীর ইসলামিকরণের পক্ষপাতী। শরিয়ত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এই রন্ধ্রপথেই ঢুকে পড়ছে আই এস বা আলকায়দা। সেই সত্যকে অস্বীকার করে হাসিনা যদি মনে করেন উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবেন তাহলে উটপাখির পরিণামই তার জন্য অপেক্ষা করবে।■

কুঁড়ে ঘরে আলো জ্বালতে কিশোরীর উদ্যম

Offering 2 LED Bulbs
"Free of Cost"

এল ই ডি বাল্ব হাতে মহিলাদের মাঝে মীরা বশিষ্ঠ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের বিজ্ঞাপনে এখন মীরা বশিষ্ঠের উজ্জ্বল মুখ। না, সে কোনো মডেল নয়। আমেরিকার হাউস্টনের বাসিন্দা। বাবা পঞ্জাবী আর মা কাশ্মীরি। বয়েস মাত্র ১৩ বছর। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিচয়ে কোনো অসাধারণত্ব নেই। কিন্তু দিল্লীর প্রায় ছ'শো দরিদ্র পরিবারে আলো জ্বালাবার জন্য এল ই ডি বাল্ব কেনার টাকা দিয়ে সে ইতিমধ্যেই খবরের শিরোনামে। ঘটনাটা খবর হওয়ার মতোই, কারণ টাকাটা তার নিজের নয়। বাবার কাছ থেকে চেয়ে দেওয়াও নয়। রীতিমতো লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে সংগ্রহ করা।

নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর উজালা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিল। উন্নত জ্যোতি উজালা প্রকল্পেরই একটা অংশ। সেভেনথ স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্রী মীরা বিজ্ঞানের একটি প্রোজেক্টে কাজ করার সময় উন্নত জ্যোতির কথা জানতে পারে। এই জানা যে নিছক জানা নয়, দেশের জন্য প্রায়ই মন কেমন করা মেয়েটির বুকে একটি আলোড়ন বিশেষ সেকথা বলাই বাহুল্য। না হলে কেউ তখনই উন্নত জ্যোতি প্রকল্পের জন্য অর্থসংগ্রহের কথা ভাবে না। টাকার জন্য মীরা প্রায় পাঁচশো জন মানুষের কাছে গেছে। সরকারি উন্নত জ্যোতি প্রকল্পের কথা বলে সে কীভাবে এই প্রকল্পে যোগ দিতে চায় তা বিশদে ব্যাখ্যা করেছে সকলের কাছে। খালি হাতে বোধহয় কেউই ফেরাননি ভারতের এই টিনএজার রাষ্ট্রদূতকে। সংগৃহীত হয়েছে মোট ২০৮০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ওই টাকায় উজালা প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার এনারজি এফিশিয়েন্সি সারভিসেস লিমিটেড (ইইএসএল)-র মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী ১৮০০ এলইডি বাল্ব কিনে বিতরণ করা হয়েছে দিল্লীর কেশবপুরম অঞ্চলের জে জে ক্লাস্টারের বেশ কয়েকটি দিন-আনা-দিন-খাওয়া বাড়িতে।

স্বাভাবিকভাবেই চারিদিকে মীরার জয়জয়কার পড়ে গেছে। কিন্তু এত অল্প বয়েসে এত বড়ো মন মীরা পেল কোথায়? দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকলেও ভারতের সঙ্গে বশিষ্ঠ পরিবারের যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। তারা প্রায়ই দেশে আসেন। পঞ্জাবে তাদের পৈতৃক বাড়ি—মীরার দারুণ পছন্দের। একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। মীরার কথায়, 'যখন বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে টাকা জোগাড় করছিলাম তখন সেই হাসিখুশি মুখগুলো মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যত দূরেই থাকি আমি ওদেরই একজন।'

সন্দেহ নেই শেকড়ের টানেই মীরার এই উদ্যোগ। কিন্তু কঠোর বস্তুবাদী পৃথিবীর মাপকাঠিতেও মীরার এই উদ্যোগ সমান মূল্যবান। সারা পৃথিবী এখন বিদ্যুৎ সাশ্রয় আর বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমানোর কথা ভাবছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে মীরার উদ্যোগ বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মীরা নিজেই বলেছে, 'এলইডি বাল্ব ব্যবহার করলে অনেক কম বিদ্যুৎ খরচ হয়, চলেও প্রায় সাত-আটবছর। আমার ভাবতে খুব ভালো লাগছে আমি এতগুলো মানুষের হাতে এলইডি বাল্ব তুলে দিতে পেরেছি। এতে খরচ তো কমবেই, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও কমবে।' উল্লেখ্য, কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুত উৎপাদনের ফলে বিপজ্জনক মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। এর ফলে শহরগ্রাম নির্বিশেষে ফুসফুসের অসুখ ক্রমশ বাড়ছে। পরিত্রাণের অন্যতম উপায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা। যাতে বিদ্যুতের খরচ কম এবং অর্থাৎ কয়লা কম পোড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের উজালা প্রকল্পের উদ্দেশ্যও তাই। গৃহস্থের পকেট বাঁচিয়ে তাকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যেই মীরার ভূমিকা প্রশংসনীয়। তার আশা, তাকে দেখে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসবে। কেউ দেশের টানে, কেউ বিবেকের টানে।

মোদী সরকার মাত্র তিন বছরের শাসনকালে ১২.৬ কোটি এলইডি বাল্ব বিতরণ করেছে এখনও পর্যন্ত। এর ফলে দৈনিক প্রায় ৪.৪৮ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু উজালা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৩০-৩৫ শতাংশ কমানো। অতদূর পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু মীরা বশিষ্ঠের মতো ঘরের ছেলেমেয়েরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে বোধহয় সময়ের আগেই ভারতের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে। নিষ্কলুষ বাতাসে নিঃশ্বাসও নিতে পারবে দেশ এবং দেশের মানুষ। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

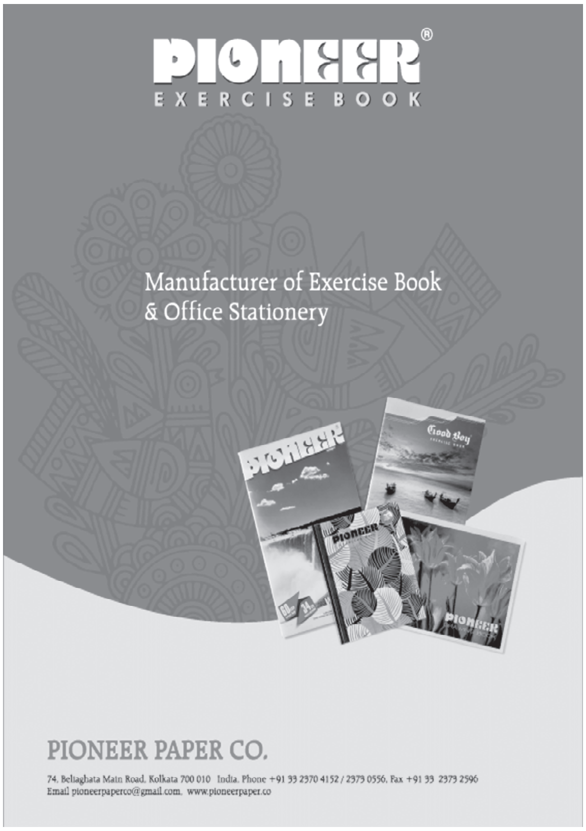

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

‘শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের মনে হবে, বিভিন্ন ভাবের এ যেন এক অত্যাশ্চর্য মিশ্রণ। একটি একক ব্যক্তিজীবনের উপর নিশ্চয়ই এত বিভিন্ন ভাব প্রশিক্ষপ্ত হয়নি। কিন্তু এসবের মধ্যেও লক্ষ্য করি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য— ব্যক্তিগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে এক সুনিশ্চিত, সূক্ষ্ম এবং আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি!’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ডায়াবেটিস রোগীর দিনচর্যা

সরোজ কুমার ভড়

একজন মধুমেহ রোগী সাধারণভাবে প্রত্যহ কী কী করবেন এবং কী কী খাবেন, তার মাত্রাই বা কীরকম হবে তার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন :

(১) বিকালে চার-পাঁচটি নিমপাতা বা ছয় ইঞ্চির মতো গিলোয় (পদ্মগোলঞ্চ)-এর ডাঁটা ধুয়ে ছাড়িয়ে আবার ধুয়ে টুকরো-টুকরো করে আবার ধুয়ে একগ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুন।

(২) ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে উঠুন।

(৩) চার-পাঁচটি নিমপাতা চিবিয়ে এক গ্লাস জল অথবা গিলোয়- এর জল খান এবং এক গ্লাস সাধারণ জল খান। তামার পাত্রে রাখা জল খেলে আরো ভাল। সারাদিনে অন্তত চার-পাঁচ লিটার জল খেতে হবে।

(৪) প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট (৩-৪ কিমি) ঘাম ঝরিয়ে হাঁটুন। হাঁটার আগে শৌচাদি ক্রিয়া সম্ভব না হলে হেঁটে এসে তা সেরে নিন। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে নিন, পায়ের ময়লা পরিষ্কার করে নিন। অবশ্যই নরম জুতা বা চটি পরে হাঁটবেন। যদি সুন্দর পরিষ্কার ঘাস থাকে তাহলে চটিজুতো না পরেই হাঁটুন।

(৫) পরিষ্কার জায়গা, যেখানে আলো বাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে সেখানে অথবা পরিষ্কার ঘাসযুক্ত মাঠেই যৌগিক জগিং কম করে পাঁচ মিনিট, সূর্য নমস্কার ও কয়েকটি ডনবৈঠক দিয়ে নিন। না পারলে দাঁড়িয়ে অথবা বসে কতকগুলি ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম ও সুক্ষ্ম ব্যায়াম করে নিন।

(৬) কম করে তিনটি প্রাণায়াম (সময় থাকলে সবকয়টি) করুন। ভস্ত্রিকা পাঁচ থেকে দশ মিনিট করে নিয়ে পায়ের, হাঁটুর, কোমোরের কয়েকটি সুক্ষ্ম ব্যায়াম করে নিন। তারপর কপালভাতি করুন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট। তারপরে হাতের, কাঁধের, পাঁজরের, পিঠের, ঘাড়ের ও মাথার সূক্ষ্ম ব্যায়াম অন্তত পাঁচ মিনিট করে নিয়ে অনুলোম-বিলোম করুন অন্তত পনেরো মিনিট থেকে ত্রিশ মিনিট।

(৭) কম করে পাঁচটি আসন--- মণ্ডুকাসন, শশকাসন, গোমুখাসন, চক্রাসন বা অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন ও যোগমুদ্রাসন (৪০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট করে) তিন থেকে পাঁচবার করে করুন।

(৮) শেষে ভ্রামরী ও উদগীথ তিন থেকে ছয়বার এবং প্রণব প্রাণায়াম অন্তত দু' মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট করুন। পরে শবাসনে বিশ্রাম নিন কম করে পাঁচ মিনিট।

(৯) এই সমস্ত শারীরিক কার্যক্রমের অন্তত ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরে শসা ১টি, টমাটো ১টি, করলা ১টি, সাদা নয়নতারা পাতা ও ফুল ৭টি করে এবং নিম পাতা তিন-চারটি এক সঙ্গে রস করে জলে মিশিয়ে খান।

(১০) ত্রিশ মিনিট পরে আধগ্লাস সামান্য গরম জলে দুই থেকে পাঁচ চামচ করে আমলা ও অ্যালোভেরার জুস মিশিয়ে (দু'টি মধুনাশিনী বটি, দুটি নিমঘন বটি, দুটি গিলোয় ঘন বটি চিবিয়ে খান।

(১১) আরো ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরে অঙ্কুরিত মুগ, গম, মেথিদানা, অল্প চিড়ে ভাজা বা মুড়ি খাওয়া যায়।

(১২) আরো ত্রিশ মিনিট পরে দরকার হলে (চায়ের পরিবর্তে) দিব্য ফার্মেসির তৈরি দিব্যপেয় এক কাপ নেওয়া যেতে পারে।

(১৩) সময়মতো স্নান করে নিন। অফিস যেতে হলে বা অন্য কাজে যেতে হলে তার আগে অথবা দুপুরে দিব্য ফার্মেসির ১ কাপ ডালিয়া দুই গ্লাস জল-সহ প্রেসারকুকারে দিয়ে, তার সঙ্গে পেঁপে, পটোল, পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, পালং ইত্যাদি দিয়ে চার-পাঁচটি সিটি দিয়ে নামিয়ে নিন। সঙ্গে করলা ভাজা অথবা সিদ্ধ, কাঁচকলা সামান্য সিদ্ধ, পাঁপড় ভাজা, সজনেপোস্ত, পিঁয়াজপোস্ত, ঢেঁড়স সিদ্ধ বা ঢেঁড়স পোস্ত, ঝিঙা সিদ্ধ অথবা ঝিঙাপোস্ত, থোড়ভাজা বা থোড়পোস্ত, একটি টমাটো সিদ্ধ করে ছাল ছাড়িয়ে, পাঁচ-ছয়টি আমন্ড বাদাম, মিষ্টি ছাড়া আমিলা আচার, টক দইয়ের সঙ্গে শসা ইত্যাদি দেওয়া যায়। এক একদিন এই সব না খেয়ে কেবলমাত্র আধকাপ মুগ সিদ্ধ, তার সঙ্গে ৩০০ গ্রাম তরমুজ অথবা ৩০০ গ্রাম কাঁকড়ি, টক আপেল ২টি, পেঁপে ও শসা নেওয়া যায়।

(১৪) বিকেলে আবার লেবু, জাম, পেয়ারা (কাঁচা), ছানা নেওয়া যায় অথবা সন্ধ্যায় সুগারফ্রি বিস্কুট-সহ এক কাপ দিব্যপেয় নেওয়া যায়। সুগারের মাত্রা বেশি থাকলে অর্থাৎ ওষুধ না খেয়ে খালিপেটে ১১০ এর বেশি এবং ভরপেট খাওয়ার দু' ঘণ্টা পরে যদি মাত্রা ১৪০ এর বেশি থাকে তাহলে শারীরিক কার্যক্রম, যোগ-প্রাণায়াম-আসনগুলি দু'বেলাই করা দরকার।

(১৫) রাত্রে খাওয়ার জন্য গম, ছোলা, যব, সোয়াবিন মিশিয়ে আটা তৈরি করে তার রুটি ২টি ও চার-পাঁচ মুঠো খই খান। রুটির সঙ্গে উপযুক্ত ডাল ও সবজি খাওয়া যেতে পারে। আবার রাত্রে দু'তিন দিন মুগ কড়াই সিদ্ধ খাওয়া যেতে পারে। ডাবল্ টোন দুধ একটু গরম করে খাওয়া যেতে পারে।

(লেখক একজন যোগবিশেষজ্ঞ)

সমাবেশ সমাচার

‘শ্রদ্ধা’র ৭৬তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৪ জুলাই সিউড়ী কালীবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা শ্রীমত্যা গীতারানি প্রামাণিককে ‘শ্রদ্ধা’র পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। তাঁর ভদ্রাসনে ওই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। সুচনাপর্বে সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুগায়িকা শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী। শ্রীমত্যা গীতারানিকে মাল্যদানে ভূষিত করেন লাউজোড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন আধিকারিক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। শ্রীমত্যা গীতারানিকে অর্ঘ্যস্বরূপ পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল, মিষ্ঠান্ন ও গীতা দেওয়া হয়। গীতা প্রদান করেন সিউড়ীর বিখ্যাত প্রাচীন কালীবাড়ির পরিচালক ও বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে জানান, গীতাদেবীর স্বামী মধুসুদন প্রামাণিকের কাছে তিনি এম.এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। স্বর্গীয় মধুসূদনবাবু সিউড়ী বেণীমাধব বিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের এক খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁর পুত্র অমিতাভ প্রামাণিক। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার পরিচালন সমিতির সদস্য ও কুবিলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক, ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্য সুব্রত সিংহ। পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শচীনদেব বর্মনের একটি গান পরিবেশন করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সখের সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার নটরাজ পূজন

গত ২৪ জুলাই দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সোনারপুরস্থিত ‘নবদীপ্তি স্কুলে’ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে নটরাজ পূজনের মাধ্যমে রাষ্ট্র আরাধনায় ব্রতী হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংস্কার ভারতীর সোনারপুর গ্রামীণ শাখা। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি প্রমুখ তথা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় নৃত্যস্রষ্টা নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য রাখেন। বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় বরুণ চৌধুরী ও আলি আকবর বাউলকে। শিব-সত্য-সুন্দর বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রাখেন সভার প্রধান অতিথি চন্দন ভট্টাচার্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল, বিষয় ভিত্তিক ছড়াকার ও কবি কৃষ্ণলাল মাইতি, সংস্কার ভারতীর শুভানুধ্যায়ী তরণীকান্ত দত্ত, ভবতোষ দাস প্রমুখ। সংগঠন সভাপতি এবং প্রাক্তন ব্লক কৃষি আধিকারিক বুদ্ধদেব মণ্ডল নানা বন্ধুরপথ অতিক্রম করে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চলার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক ও সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ পরিমলেন্দু সরকার। বাঁশী

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ
(দক্ষিণবঙ্গ)
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা
সোনারপুর

বাজিয়ে শোনান নারায়ণ দাস। শব্দম-এর শিল্পী ঈষিতা রায় নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়া প্রজ্ঞাময়ী মণ্ডলের নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সম্পাদক অমিত ঘোষ দস্তিদার ও ঐন্দ্রিলা মল্লিক (রায়)। সব শেষে অমিত ঘোষ দস্তিদারের লেখা ও পরিচালনায় নাট্য সম্পাদক উত্তম ঘোষের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নাটক ‘রাবণ’ এক নতুন মাত্রা যোগ করে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন পরিমলেন্দু সরকার, সন্ধ্যা রায়, সুষেন কুমার রায়, গোপাল চন্দ্র দাস বাউল, মলয় মণ্ডল, রাজকুমার মিস্ত্রি, বুদ্ধদেব মণ্ডল, বিমল সরকার, অমিত ঘোষ দস্তিদার। অনুষ্ঠানে প্রদেশ সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় বিশেষ ভাবে পথনির্দেশ করেন। সংগঠন সম্পাদক শেখর মণ্ডল অনুষ্ঠান সাফল্যের সার্বিক দায়ভার বহন করেন।

পরলোকে রণেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাঁকুড়া শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রণেন্দ্রনারায়ণ রায় (৮৫) গত ১৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। রণেনদার বাড়ি বাঁকুড়া জেলায় হলেও পড়াশুনার জন্য আসানসোলে যান। সেইখানেই তিনি স্বয়ংসেবক হন। তারপর বিস্তারক হিসেবে সেখানেই সঙ্ঘের কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হলে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সত্যাগ্রহ হয়। সে সময় সঙ্ঘের নির্দেশে রণেনদা বাঁকুড়ায় এসে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। পূজনীয় গুরুজী প্রথমবার বাঁকুড়া প্রবাসে এসে শোনেন সত্যাগ্রহী রণেনদা পা ভেঙে বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। শ্রীগুরুজী রেলস্টেশন থেকে সোজা রণেনদার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন (১৯৬২-তে)। রণেনদা ইন্দো-জার্মান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনে চাকুরি করতেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন জেলায় ঘুরতেন এবং সঙ্ঘকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বড় কালীতলা সরস্বতী শিশু মন্দিরের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যামন্দিরের গৃহ নির্মাণেও তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেন। তিনি স্ত্রী, একপুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঁকুড়া জেলার স্বয়ংসেবকরা মর্মাহত। তাঁর পরিবারবর্গকে বাঁকুড়ার স্বয়ংসেবকরা সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, তাঁর পুত্র নীলোৎপল রায় প্রথমবর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক।

কাঁথিতে শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী পালন

গত ৬ জুলাই কাঁথির রাও রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. হরিপদ মাইতি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম স্বাস্থ্যসচিব প্রশান্ত প্রামানিক। সমিতির স্থায়ী সভাপতি তমালপল্লব বিশ্বাস (সান্যাল) প্রাস্তবিক ভাষণ দিয়ে সভার সূচনা করেন। সম্পাদক পরিতোষ দাস সভা পরিচালনা করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির সদস্য বিষ্ণুপদ জানা, সুমিত মিদ্যা, অসীম ঘোড়াই, অরুণ জানা, মুনমুন খুটিয়া প্রমুখ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পরলোকে সুনীল চৌধুরী

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের (পশ্চিমবঙ্গ) প্রথম সভাপতি সুনীল কুমার চৌধুরী গত ২৫ জুলাই ভোরে বর্ধমান শহরের বাদামতলায় নিজের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও এক নাতনি-সহ আত্মীয়- স্বজন ও গুণগ্রাহীদের রেখে গেছেন। বেশকিছুদিন থেকেই তিনি ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন।

১৯৮১ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। ১৯৭৯ সালে ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে যখন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় সেসময় পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের তিনি নেতৃত্ব দেন।

সুনীল চৌধুরী ছিলেন একজন যোগ্য ও কুশলী সংগঠক। তাঁর যৌথ সুসংগঠিত পরিবার থেকে তিনি সংগঠকের গুণাবলী লাভ করেছিলেন। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ হয়েছে অনেকের। এরকম সুসংগঠিত যৌথ পরিবার আজকে দিনে বিরল। তিনি মিষ্টি মধুর সদাহাস্যময় ব্যবহার দিয়ে সকল মানুষের মন জয় করে নিতে পারতেন।

DUTA®
SPICE POWDER & PAPAD
থাকে যদি
ডাটা®
জমে যায় রান্নাটা
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
FRESH N' PURE
POWDER
CUMIN
POWDER
CORIANDER
POWDER
RED CHILLI
POWDER

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : **(M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548**
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

অলিম্পিকের বিচিত্র ঘটনা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৮ সালের চতুর্থ অলিম্পিকের আসর। নিয়ম কানুনের অত কড়াকড়ি নেই। তখন প্রত্যেক ইভন্টেরই বিচারক থাকত আয়োজক দেশের। এছাড়াও ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে তখন দৌড়বার সময় প্রতিযোগিদের জন্য নির্দিষ্ট লেনের ব্যবস্থাও ছিল না। সেই ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে উঠল চারজন। আমেরিকার তিনজন— কার্পেন্টার, টেলর ও রবিনস এবং বৃটেনের একজন এস ডব্লুউ এইচ হলসওয়েল। ফাইনাল শুরু হলো। কোনো ‘লেন’-এর ব্যবস্থা না থাকায় কিছুটা এগিয়েই প্রতিযোগী চারজনই একই সরলরেখায় চলে এলেন। প্রথমে কার্পেন্টার, তার পেছনে রবিনস ও তার পরে হলসওয়েল। এবং সব শেষে ইউ এস-এর টেলর। এইভাবেই যে যার নিজের গতি বজায় রেখে চলল কিছুটা। আড়াইশো মিটার যখন ছাড়িয়ে গেল তখনও প্রথম তিনজন কার্পেন্টার, রবিনস ও হলসওয়েলের মধ্যে দূরত্ব গজ দুই-তিন করে। কিন্তু এর পর থেকেই কার্পেন্টার একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে ফিনিশিং লাইনের দিকে। তার সঙ্গে ইউ এস-এর রবিনস এবং তৃতীয় বৃটেনের হলসওয়েলের মধ্যে দূরত্ব তখনও অবশ্য গজ তিনেকের মতো। ইতিমধ্যে কার্পেন্টার প্রায় ফিনিসিং লাইনের কাছাকাছি ঠিক তখনই বৃটিশ বিচারকরা ‘ফিনিসিং টেপ’ ছেড়ে ফাউল ফাউল বলে চেঁচিয়ে উঠল।

জিম থর্প

নিমেষের মধ্যে ডজনখানেক কর্মকর্তা ঢুকে পড়ল ট্র্যাকে। ততক্ষণে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে গেছেন কার্পেন্টার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছেন রবিনস এবং হলসওয়েলেও। কিন্তু বৃটিশ কর্তারা তা মানতে রাজি নন। তাঁদের অভিযোগ যে ইউ এস-এর অ্যাথলিট রবিনস বৃটিশ প্রতিযোগী হলসওয়েলের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং নতুন করে আবার ফাইনাল হবে। সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের রাজা এডোয়ার্ড। তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখাতেই রাজার প্রিয় অ্যাথলিট হলসওয়েলকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখতে সংগঠকরা এক নোংরা খেলায় মাতলেন। চাপের কাছে মাথা নোয়ালেন না আমেরিকান অ্যাথলিটরাও। তাঁরা পুনরায় ফাইনালে নামতে অস্বীকার করলেন। বৃটিশ কর্মকর্তারা হলসওয়েলের গলায় পরিয়ে দিলেন সোনার পদক!

সেই শুরু। তারপর দিন যত এগিয়েছে একের পর এক অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বৃটিশ কর্তারা পবিত্র বিশ্ব ক্রীড়া অলিম্পিক এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও হাস্যাস্পদ করেছেন। এই সমস্ত কারণেই শেষের দিকে ১৯০৮-এর লন্ডন অলিম্পিককে অনেকে রসিকতা করে বলেছেন— ‘ব্যাটল অব শেফার্ডস বুশ।’

এখানেই শেষ নয়। এই রকম আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল সেবার লন্ডনে। ‘সাইক্লিং’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুষলধারে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সে এক চূড়ান্ত অব্যবস্থা। ফলে এই ইভেন্টে অর্ধেকের বেশি প্রতিযোগীর সাইকেলের টায়ার ফেটে যায় এবং এখানেও কন্ট্রোভার্সির মধ্য দিয়ে স্বর্ণপদক জেতেন বৃটেনেরই জনৈক সাইক্লিষ্ট।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা মনে রেখেই স্যার কুবার্তিন আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার আয়োজন করেছিলেন ১৮৯৬ সালে। কিন্তু তার বারো বছর পরেই যে এত নোংরা সেই পবিত্র ক্রীড়ায় জমতে পারে তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। প্রতিযোগিতা চলাকালীন যে চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল তার সূত্রপাত উদ্বোধনী দিন থেকেই। উদ্বোধনী দিনে রাজনৈতিক কারণে সংগঠকরা হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইউ এস এ, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের জাতীয় পতাকা রাখেননি। এবং সেইজন্যেই আমেরিকান অ্যাথলিটরা মার্চপাস্টের সময় রাজা এডোয়ার্ডকে অশ্রদ্ধা জানাতে তাদের জাতীয় পতাকা নত করেননি। এই সমস্ত কারণেই লন্ডন অলিম্পিকের প্রথম দিন থেকে সংগঠক এবং অ্যাথলিটদের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের সংঘাত লেগেই ছিল। ইংরাজিতে একটা কথা আছে— ‘আ স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন।’ কথাটা মনে রেখেছিলেন আইওসি কর্তাব্যক্তিরা। তাই ১৯০৮-এর হাঙ্গামার পরেই তারা বেশ কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। প্রবর্তিত হলো অ্যাথলেটিক্স ‘লেন’।

এই অলিম্পিকের চমক আমেরিকান অ্যাথলিট জিম থর্প। পেন্টাথলন এবং ডেকাথলন উভয় বিভাগেই সোনার পদক তুলে নিয়ে সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দিলেন বাইশ বছর বয়সি থর্প। রাজা গুস্তভ মন্তব্য করলেন— ‘হি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাথলিট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।’ মেনে নিলেন আমেরিকার ক্রীড়া সাংবাদিকরাও। উনিশ শতকের একেবারে মাঝামাঝি সময়ে থর্পকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের সেরা অ্যাথলিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু মন্দভাগ্য এই থর্পের। অলিম্পিক পদক জয়ের মাত্র দেড় বছর পরেই পেশাদারিত্বের অভিযোগে কেড়ে নেওয়া হলো সেই অনন্য সম্মান। থর্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল যে কলেজ জীবনে তিনি একটি বেসবল ক্লাবে পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তখনও অলিম্পিকে পেশাদারদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

একজন অনন্য প্রতিভাধর অ্যাথলিট ক্ষণিকের জন্য ক্ষণপ্রভার মতোই সমস্ত সম্মান পেলেন ও হারালেন। শেষ পর্যন্ত তার পদক দুটি অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে লস লঞ্জেলসের অলিম্পিকের আসরে থর্পের উত্তরাধিকারের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। বেচারা থর্প! জীবিতকালে এক চাপা অভিমান আর দুঃখে কাটিয়ে মারা যাওয়ার পর ফিরে পেলেন পুরনো সাম্রাজ্য।

এর বেশ কিছুদিন পরে আমেরিকার একটি গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে ‘জিম থর্প’। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর একটি মর্মর মূর্তিও। স্ট্যাচুর নীচে খোদাই করা আছে সেই স্মরণীয় উক্তি— স্যার ইউ আর দ্য মোস্ট ওয়ান্ডারফুল অ্যাথলিট অব দ্য ওয়ার্ল্ড।’ ■

শব্দরূপ-৭৯৯

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
১১		১২	■		■		■
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বসুদেবপুত্র, কৃষ্ণ, ৪. নরকপালধারী; শিব, ৭. নাগরাজ; অনন্ত, ৯. শোধক, যে পবিত্র করে; অগ্নি, ১০. প্রশংসাসূচক উক্তি, শাবাস, ১১. পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ, ১৩. রসহীন, শুষ্ক, ১৪. যার পেট বড়, গণেশ।

উপর-নীচ : ১. বানররাজ, সুগ্রীবের অগ্রজ, ২. পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্রঘোটকী, ৩. '—থেকে সিংহদুয়ার, এই তোমাদের পৃথিবী', ৫. নির্জল প্রদেশের এক শ্রেণীর বৃক্ষ যার পত্রমূলে জল সঞ্চিত থাকে, ৬. সাধুভাষায় 'ইন্দ্রলুপ্ত', ৮. বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ১০. শিকারি পাখি, ওল্টালে ফুল, ১১. কৃষ্ণের নগরী (কাথিয়াওয়াড়ে আরবসাগর তীরে), ১২. আম, ১৩. 'চিরস্থির কবে — হায় রে জীবননদে?'

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৬

নি	র্যা	স	■	জ	ল	নি	ধি
রে	■	ং	■	ন	■	■	তা
ট	■	শ	স্ব	র	■	■	ং
■	■	প্ত	■	ব	ক	■	■
■	■	ক	বি	■	পা	■	■
ত্র্য	■	■	না	কা	ল	■	ম
স্ব	■	■	য়	■	ভা	■	ল্লা
ক	প	র্দ	ক	■	তি	তি	র

সঠিক উত্তরদাতা

প্রিয়ম দে,
বাঁকুড়া
শিবেন্দ্র চৌধুরী
নামোপাড়া, পুরুলিয়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

☐ ৭৯৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

দলকে ঠিক রাখার জন্য সদস্যদের অনুশাসন পালন শুধু নয়, বরং সাধারণ মানুষও যেন তাদের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়--- এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার এক মাধ্যম মাত্র। জনতার মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজন হলো আইন প্রণয়নে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলি স্বয়ং এক্ষেত্রে উদাহরণ প্রস্তুত করুক। স্ব-শাসনের ভাবনা ও ক্ষমতা গণতন্ত্রের মূল কথা। যদি দলগুলি নিজেরা নিজেদের শাসিত না করতে পারে তবে সমাজে স্বশাসনের ইচ্ছা নির্মাণ করার আশা কীভাবে করতে পারে? যখন একদিকে সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গ্যারান্টি ও রক্ষা আবশ্যক, তখন সর্বসাধারণের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সহিষ্ণু-ভাবনা যত বেশি হবে, অধিকার-ভাবনা তত কম হয়ে যাবে। যদি কোনো দলের কাজ সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে যা খুশি তাই করে, তাহলে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য স্থাপন করবে? এজন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের সদস্যদের জন্য এক আচরণবিধি নির্ধারিত করে তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

ভারতীয় রাজনীতির ভাবনা ভারতের সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন থেকে আলাদা হয়ে করা যেতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সৃষ্টির বিভিন্ন দিক এবং জীবনের বিভিন্ন ভাগের দৃশ্যতাকে স্বীকার করে তার অভ্যন্তরে একতার অনুসন্ধান ও সামঞ্জস্য স্থাপন করে। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি একাত্মমূলক। সমাজবাদ ও প্রজাতন্ত্র দু'টিই শ্রেণীসংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যদিও দুটিরই উদ্দেশ্য হলো সংঘর্ষ সমাপ্ত করে একতা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথ তারা গ্রহণ করেছে তাতে 'শ্রেণী' সমাপ্ত না হয়ে তা রূপান্তর হয়েছে এবং সংঘর্ষ আরও ভীষণ রূপ ধারণ করেছে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ২

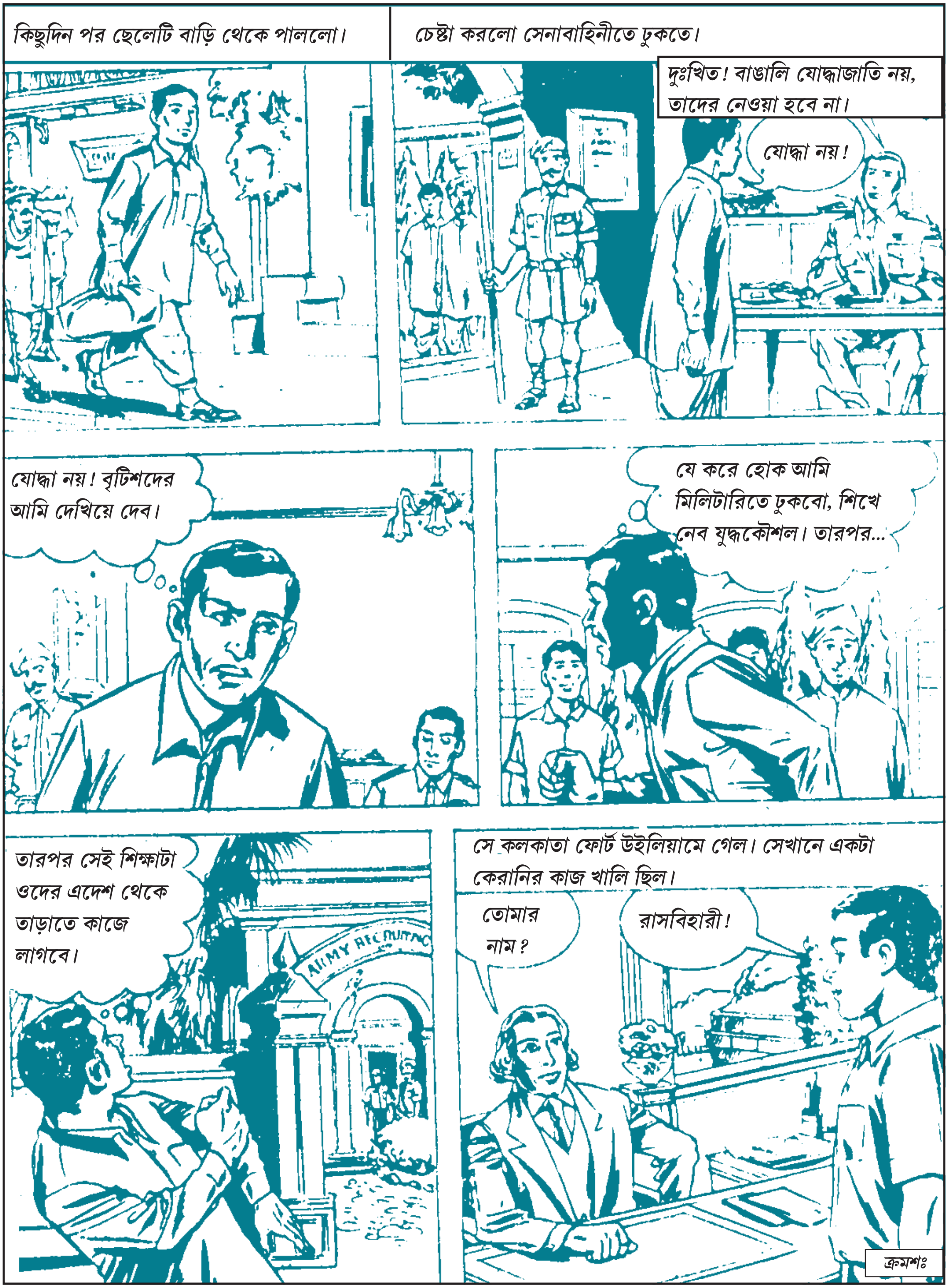
কিছুদিন পর ছেলেটি বাড়ি থেকে পাললো।
চেষ্টা করলো সেনাবাহিনীতে ঢুকতে।
দুঃখিত! বাঙালি যোদ্ধাজাতি নয়, তাদের নেওয়া হবে না।
যোদ্ধা নয়!
যোদ্ধা নয়! বৃটিশদের আমি দেখিয়ে দেব।
যে করে হোক আমি মিলিটারিতে ঢুকবো, শিখে নেব যুদ্ধকৌশল। তারপর...
তারপর সেই শিক্ষাটা ওদের এদেশ থেকে তাড়াতে কাজে লাগবে।
ARMY RECRUITING
সে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে গেল। সেখানে একটা কেরানির কাজ খালি ছিল।
তোমার নাম?
রাসবিহারী!
ক্রমশঃ

বাঘ চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সারা পৃথিবীর জঙ্গলে যত বাঘ আছে তার থেকে বেশি আছে কৃত্রিম ও অবৈধ ব্যাঘ্র প্রজনন কেন্দ্রগুলির বন্দিশালায়। সংখ্যাটা প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার। অবৈধ ব্যাঘ্র প্রজননের উদ্দেশ্য বাঘের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ব্যবসা। এই প্রজনন কেন্দ্রগুলি মূলত রয়েছে চীন, ভিয়েতনাম, মায়নামার ও লাওসে। সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্রদিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। অংশ নিয়েছিল বিশ্বের ৪৫টি এনজিও। সেমিনারের মঞ্চ থেকে অবিলম্বে অবৈধ ব্যাঘ্র প্রজনন, বাঘের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ব্যবসা এবং চোরাশিকার বন্ধ করার জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশকে অনুরোধ করা হয়। সেমিনার অলঙ্কৃত করেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী অনিল মাধব দাভে। তিনি জানান, সংরক্ষণের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ভারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন ভারতে বাঘের সংখ্যা ২২২৬টি।

পশ্চিমবঙ্গে জাকির নায়েককে থামাতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ইসলামি সন্ত্রাসের প্রচারক জাকির নায়েকের মালিকানাধীন পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধ করা হয়নি। হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভিসিডি ডিভিডিও বিক্রি হচ্ছে অবাধে। সম্প্রতি হিন্দু জনজাগৃতি সঙ্ঘ-সহ চারটি হিন্দু সংগঠন এই মর্মে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে। তাদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এবং প্রধান বিরোধীপক্ষের প্রচ্ছন্ন মদতে বিভিন্ন জেলায় মসজিদে মাদ্রাসায় ইসলামিক জলসায় রমরম করে বাজছে জাকির নায়েকের ভাষণ সংবলিত সিডি। ভিডিয়োর মাধ্যমে চলছে ইসলামি সন্ত্রাসের প্রচার। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে হিন্দুদের জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের হুমকিতে হিন্দুরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে পারছে না। অভিযোগকারীরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ করার দাবি জানান। খবরে প্রকাশ, রাজ্যপাল সমস্ত অভিযোগ শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেন। অভিযোগকারী দলের প্রতিনিধিত্ব করেন হিন্দু জনজাগৃতি সঙ্ঘের চিত্তরঞ্জন সুরাল, হিন্দু এক্সিসট্যান্স ফোরামের উপানন্দ ব্রহ্মচারী, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্যশ্রী চৌধুরী, নিখিল বঙ্গ নাগরিক সমিতির সুভাষ চক্রবর্তী এবং ধর্ম উত্থান সমিতির বিকর্ণ নস্কর।

কেন্দ্রকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে বলল হিমাচল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। কিন্তু হিমাচল প্রদেশের হাইকোর্ট কেন্দ্রের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ৬ মাসের মধ্যে গো-হত্যা, গো-মাংস ভক্ষণ এবং রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সম্প্রতি বিচারপতি রাজীব শর্মা এবং সুরেশ্বর ঠাকুরকে নিয়ে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ ৭১ পৃষ্ঠার রায়ে এই নির্দেশ দেন। আদালতের রায়ে গো-হত্যা বন্ধ করতে কেন্দ্রকে অবিলম্বে প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবরে হিমাচল প্রদেশের হাইকোর্ট একই নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে রায়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানায়।

SMALL INVESTMENT TO FULFILL
OUR FINANCIAL GOALS......

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
8 August - 2016 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

Wide beam angle for better light spread

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

SURYA LED

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

lighting
fans
appliances
pipes

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!